পবিত্র কোরআনের আলোকে

সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ডা. এ. এন. এম. এ. মোমিন

পবিত্র কোরআনের আলোকে

সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ডা. এ. এন. এম. এ. মোমিন

প্রকাশনায় :

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স
Ale Rasul Publications
[[[হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি]]]
৩৯ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
01551 364529, 01973 364529, E-mail: ale.rasul@outlook.com
Find us on facebook ale.rasul@outlook.com
Follow us on twitter ale.rasul@outlook.com

কৃতজ্ঞতায় : মুহিব্বিনে আহলে বাইত ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

পবিত্র কোরআনের আলোকে

সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

লেখক : **ডা. এ. এন. এম. এ. মোমিন**

সম্পাদনায় : **হুজ্জাতুল ইসলাম মোঃ ইন্তেখাব রাসূল**

প্রকাশকাল : **২৫ মার্চ, ২০১৬ ঈসায়ী**

প্রকাশনায় : **আলে রাসূল পাবলিকেশন্স**
৩৯ গাউসূল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
E-mail: **ale.rasul@outlook.com**
ফোন: **০১৫৫১ ৩৬৪৫২৯, ০১৯৭৩ ৩৬৪৫২৯**

পরিবেশনায় :

- **র‍্যামন পাবলিশার্স**, আলী রেজা মার্কেট, ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- **সদর প্রকাশনী**, ইসলামি টাওয়ার (৩য় তলা), ১১, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- অন-লাইন পরিবেশক: রকমারি **www.rokomari.com/publisher/2564**

প্রচ্ছদ : **মোঃ শাহজাহান আলী**

কৃতজ্ঞতায় : **মুহিব্বিনে আহলে বাইত ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।**

বিনিময় মূল্য : **৳ ২০০.০০**

Pobitro Koraner Alokey
Samajik Biporjoy O Prakritik Durjog
by **Dr. A. N. M. A. Momin**
Edited by **Hujjatul Islam Md. Intakhab Rasul**
Published by **Ale Rasul Publications**
39 Gausul Azam Super Market, Nilkhet, Dhaka-1205.
Phone: **01973364529, 01551364529**
E-mail: **ale.rasul@outlook.com;** Price: **Tk.200.00**
With the best compliment of
"Muhibbin-e-Ahlul Bayet Foundation, Bangladesh"

ISBN: 978-984-91642-9-6

ডা. এ. এন. এম. মোমিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডা. এ. এন. এম. মোমিন ১৯৫১ সালে ৪ এপ্রিল রাজবাড়ী জিলার বালিয়াকান্দি উপজেলার পদমদী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুস সামাদ, মাতার নাম সৈয়দা শামসুন নাহার। তিনি ১৯৬৬ সালে রামদিয়া বি এম বি সি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে তিনি যথাক্রমে স্নাতক সম্মান ও এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র অবস্থা থেকে তার বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখনী দৈনিক আজাদ, দৈনিক বাংলার বাণী, বাংলাদেশ টাইমস, সাপ্তাহিক সিনেমা, সাপ্তাহিক হলিডে ও সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে 'লিয়াজোঁ অফিসার' হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। চাকুরী সূত্রে তিনি যুক্তরাজ্যের কার্ডিফে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজী থেকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন পোর্ট এণ্ড শিপিং এডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি জাপান, ইতালী, শ্রীলংকা থেকে বন্দর ও জাহাজ বিষয়ক বিভিন্ন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি সরকারী দলের নেতা হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জবল আলী বন্দর, সৌদী আরবের জেদ্দা, মিশরের আলেকজেন্ড্রারিয়া ও ইরানের বন্দর আব্বাস পরিদর্শন করেন। ২০০৯ সালে 'পরিচালক প্রশাসন' হিসেবে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি পুরোপুরি ইসলামের ইতিহাস, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সুফি দর্শন বিষয়ক লেখা ও গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে তিনি একটি সেবামূলক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ –৫
লেখকের কথা –৮
ভূমিকা –১৯
কুরআনের আলোকে সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা খোদায়ী গজব-২৪
ইবাদত কি ও কেন? –৩০
কুরআনে বর্ণিত সামাজিক শাস্তি –৪১
সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ –৫৩
আল্লাহর ওলীদের পরিচয় ও মর্যাদা –৭০
রাসূল (দ.)-এর বিদায় হজের শেষ ভাষণ ও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব –৭৪
সামাজিক অত্যাচার ও কার্পণ্যের কুফল –৯২
মহাবিশ্ব সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা প্রদানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা –৯৯
প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন –১০৬
মানবীয় কষ্ট ও স্বস্তি –১০৯
মানবীয় আচরণ ও ঐশী দণ্ডবিধান –১১২
উপসংহার –১১৯

মুখবন্ধ

'ইসলাম' হচ্ছে একটি সার্বিক জীবন ব্যবস্থা যা সর্বকালে, সর্বযুগে, সকল ক্ষেত্রে, সকল স্থানে সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম চির গতিশীল, চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন বিধান আর মহান ঐশী গ্রন্থ 'কুরআন' হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সংবিধান। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক কী, স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের শর্তগুলো কী, আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে মানবের ভূমিকা কী, সমাজকে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে মানবের করণীয় কী, মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও নীতিগত আচরণের স্বর্গীয় বা ঐশী নির্দেশনাগুলো কী প্রভৃতি এ মহা গ্রন্থ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাকিছু সুন্দর এবং কল্যাণকর তাই ইসলাম। ধর্ম এসেছে মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য আসেনি। মানুষ যদি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর হুকুমকে মান্য করে, আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চলে, তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে উভয় জগতে পুরস্কৃত করেন। আর যদি অন্যথা হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তার উপর বিভিন্নভাবে খোদার শাস্তি কিংবা গজব নিপতিত হয়, বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ নেমে আসে এ ধরাধামে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ হচ্ছে আল্লাহর হুকুম তথা কুরআন না মানার ফলশ্রুতি।

মানুষ যখন অবিচার, অনাচার, ব্যভিচার, কুসংস্কার, অন্যায়, খুন-খারাবী, রাহাজানি, দূর্নীতি, ধর্মহীনতা, সন্ত্রাস, বর্বরতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি পাপে নিমজ্জিত হয়, তখন ধরাধামে সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ নেমে আসে এবং মানব সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতীতে আ'দ, সামুদ, বন নিবাসীসহ বহু জাতি কীভাবে ধ্বংস হয়েছে তার বিবরণ পবিত্র কুরআন মজিদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় করা বা তাকওয়া'র উপর মহান আল্লাহ তায়ালা অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঐশীগ্রন্থ কুরআন হচ্ছে একটি অলৌকিক গ্রন্থ যা সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের মানুষের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের একটি আলোকবর্তিকা। কুরআনকে জানলে হবেনা, কুরআনকে আমল করতে হবে।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ডা. এ এন এম এ মোমিন তাঁর "পবিত্র কোরআনের আলোকে সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ" শীর্ষক গ্রন্থে এ সত্যটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণ কী, ইবাদত কী ও কেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইবাদতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ এবং প্রকৃতি, তাগুত, শয়তান, জ্বীন ও ফেরেশতাদের ইবাদত এং প্রবৃত্তি পূজা প্রসঙ্গ, কুরআনের আলোকে সামাজিক শাস্তি প্রসঙ্গে, আল্লাহর ওলীদের পরিচয়-মর্যাদা, মহানবী (দ.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ ও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ওলীদের প্রকারভেদ ও আধ্যাত্মিক প্রশাসন, ইমামত ও উত্তরাধিকার, সামাজিক অত্যাচার ও কার্পণ্যের কুফল, মহাবিশ্ব সৃষ্টি রহস্যের ব্যাখ্যা প্রদানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, মানবীয় কষ্ট ও স্বস্তি প্রভৃতি কুরআন-হাদীসের আলোকে এ গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মানুষ হচ্ছে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা জীব। এহেন সেরা জীব কীভাবে তার স্বভাব দোষে পশুর চাইতেও অধম হতে পারে সে বিষয়টিও লেখক কুরআন-হাদীসের আলোকে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নবুয়তের পরিসমাপ্তির পর মহানবী (দ.)-এর বেলায়েতের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (ক.) যিনি খেলাফতেরও যোগ্য উত্তরাধিকারী বটে। হযরত আলী (ক.)-এর পর হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন সহ পরবর্তী ১২ জন ইমাম এবং বংশের ক্রমধারায় ওলীয়ে কামেলীনগণ বেলায়তের প্রবাহকে জারি রেখে চলেছেন যা' হাশর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ ওলী-বুজুর্গদের হাতে মহান আল্লাহ তায়ালা আধ্যাত্মিক জগতের প্রশাসনের ভার ন্যাস্ত করেছেন। আল্লাহর জমীনে যখন বিপর্যয় ও দূর্যোগ আসে, তখন এই ওলীয়ে কামেলীনগণ জনগণ যাতে বিপর্যয় ও দূর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পায় সেজন্য মহানবী (দ.)-এর সুপারিশ কামনা করে খোদার কাছে ফরিয়াদ করেন। ফলশ্রুতিতে মানব সমাজ মুক্তিলাভ করে। সুতরাং বিপর্যয় ও দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেহ, মন, আত্মার পরিশুদ্ধি অত্যাবশ্যক এবং এ পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য ওলী-বুজুর্গের সোহবতের কোন বিকল্প নেই। বলাবাহুল্য, আল্লাহকে পেতে হলে মহানবী (দ.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা থাকতে হবে এবং মহানবী (দ.)-এর ভালবাসা পেতে হলে তাঁর বেলায়তের উত্তরাধিকারী ওলী-বুজুর্গদের সান্নিধ্যে যেতে হবে এবং তাঁদেরকে ভালবাসতে হবে।

ঐশী বিধান অনুযায়ী 'খেলাফত' ও 'ইমামত' আহলে বাইত এবং তাঁদের উত্তরাধিকারী বংশধরদের হাতে ন্যস্ত থাকার কথা যার সুস্পষ্ট ঘোষণা মহানবী (দ.) গাদীরে খুম এবং বিদায় হজ্বের ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন যা মহানবী (দ.)-এর তিরোধানের পর মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের কারণে পালিত হয়নি। মুসলিম বিশ্বের বিপর্যয় ও অধপতনের এটিও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে লেখক পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করেছেন।

পাশ্চাত্য বিশ্বে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (যথা: পুঁজিবাদ, বাজার অর্থনীতি, সামন্তবাদ) ছদ্মাবরণে অনাচার, ব্যভিচার, যৌনাচার, শোষণ, বঞ্চনা, অপসংস্কৃতি, আধিপত্যবাদ যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেটাও সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের অন্যতম কারণ বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন। মোট কথা, ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলেই আজ আমাদের এ দূর্গতি, ভোগান্তি, অশান্তি ও বিপর্যয়। তাই সারা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামকে সঠিকভাবে অনুশীলন ও প্রয়োগ করতে হবে এবং আধ্যাত্মিক সাধকদেরকে ধর্মগুরু ও শাসনগুরু হিসেবে মানতে হবে ও তাঁদের সান্নিধ্যে যেতে হবে। কুরআন-হাদীসের শিক্ষাকে জীবনের সর্বস্তরে কাজে লাগাতে হবে। লেখক এ বিষয়গুলো বর্তমান গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বইটির আবেদন সর্বজনীন। সঙ্কাটাপন্ন বিশ্ব মানবতা এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। বইটির ভাষাশৈলী সুন্দর, প্রাঞ্জল ও চমৎকার। আমি এমন একটি চমৎকার বই উপহার দেয়ার জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই এবং বইটির বহুল প্রচার ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহুমা আমিন! বেহুরমতে সাইয়েদিল মুরছালিন।

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান

অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক

সাবেক সভাপতি, মাইজভান্ডারী একাডেমী।

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি), যিনি অতিশয় দয়ালু (সাধারণভাবে সবার জন্য) এবং পরম করুণাময় (বিশেষ কিছু ব্যক্তির জন্য এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে)

লেখকের কথা

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُواْ فِى ٱلأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুণ স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে, যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে উহারা ফিরিয়া আসে। তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছে উহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।" [সুরা ৩০ রুম, আয়াত-৪১-৪২]

পবিত্র কোরআনে উক্ত আয়াত দ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, দৃশ্যমান যত সামাজিক বিপর্যয় দেখতে পাওয়া যায় বা সমুদ্রে বা প্রকৃতিতে যে দূর্যোগ সংঘটিত হয় তার মূল কারণ মানুষের কৃতকর্ম। অর্থাৎ আল্লাহ যে জীবন বিধান মানুষের জন্য নবী-রাসুলদের মধ্যমে দান করেছেন তার ব্যাপক লংঘন তার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহতায়ালা বিশ্ববাসীকে অতীতের ইতিহাস, পুরাকীর্তি, সভ্যতা সরেজমিনে পরিদর্শন করে ব্যাপক গবেষণা করে সেই সভ্যতার ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। মানব জাতির দূর্ভাগ্য যে, তারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাপকভাবে খোদাদ্রোহীতার পথ অবলম্বন করে অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত আছে।

মহান রাব্বুল আলামিন মানব জাতির সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। তিনি চান না যে, মানব জাতি তাঁর আদেশ অমান্য করে ক্ষতিগ্রস্থ হোক। তাই তিনি যুগে যুগে তাঁর নিয়োজিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যাতে তারা আল্লাহ বিদ্রোহের পথ অবলম্বন না করে। তাই আদম (আ.) থেকে শুরু করে

মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানব জাতির পথ প্রদর্শণের জন্য যত নবী রাসুল পাঠিয়েছেন, তাদেরকে যে মূলমন্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন তা হচ্ছে 'তাওহীদ'। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব। স্থান, কাল, পাত্রভেদে আপাতদৃষ্টিতে দ্বীনের বা ধর্মের তথা জীবন ব্যবস্থার আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, বিয়ের আইন-কানুন, এবাদতের উপায় পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন হয়েছে কিন্তু মূলমন্ত্র একচুলও বদলায়নি। এই সার্বভৌমত্বের, তাওহীদের অপর নাম 'সেরাতুল মুস্তাকিম', 'দ্বীনুল কাইয়েম', চিরন্তন, শাশ্বত, সনাতন জীবন পথ। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পথ বা জীবন দর্শন সম্পর্কে বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে যে মানুষ মূলত সামাজিক জীব এবং সে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তার কারণ কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং জীবন ধারণের জন্য তাকে কোনো না কোনো কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতেই হয়। পরনির্ভরশীলতার কারণেই তাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয়। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে গেলে মানুষকে একটি সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়-নীতি ভিত্তিক নিয়ম-নীতি, আইন-কানুনের অর্থাৎ সিস্টেমের মধ্যে বাস করতে হয়। যে সিস্টেমের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ামক থাকতে হয়। এই সিস্টেম বা নিয়ামককে জীবন ব্যবস্থা বলা যায়। স্বভাবতই মানুষ ধারণা করে জীবন ব্যবস্থায় একদিকে থাকবে আত্মিক উন্নয়নের ব্যবস্থা, অন্যদিকে আইন-কানুন, রীতি-পদ্ধতি, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার ও সর্ববিষয়ে বিধান থাকতে হবে। একটি জীবন ব্যবস্থা বা দ্বীন ছাড়া সমাজবদ্ধ জীবের বাস করা অসম্ভব। মানুষের কাছে কাম্য হচ্ছে এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেটি সঠিক ও নির্ভূল এবং প্রকৃতই সর্বজন কল্যাণকর। সেই জীবন ব্যবস্থা সমাজে চালু করার ফলে মানুষ এমন একটি সমাজে বাস করবে যেখানে কোনো অন্যায় থাকবে না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনো প্রকার অন্যায় বা অত্যাচার বা প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা থাকবে না, অবিচার থাকবে না। যেখানে জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা হবে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে চিন্তা, বাক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হবে সংরক্ষিত এবং মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও রক্তপাত থাকবে না।

অবশ্য মানবজাতির মধ্যে ভালো মন্দ সর্বরকমের লোকই থাকে সেহেতু এটি শতভাগ অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে এটি যদি যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায় তাই হবে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এমন একটি জীবন-বিধান, দ্বীন বা ধর্মই নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন।

স্রষ্টার দেওয়া এই নিখুঁত ও ত্রুটিহীন জীবন ব্যবস্থা কায়েম বা মানব জীবনে কার্যকরী করলে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ, সংঘর্ষ, রক্তপাত বিলুপ্ত হয়ে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন আমরা পেতে পারি। এটি বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি হলো (১) আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী, (২) আল্লাহর মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তির শাসন অর্থাৎ নবী রাসূল, উলিল আমর, খলিফা, ওলিয়াম মুর্শিদের শাসন যা হবে আল্লাহর বিধি-বিধান অর্থাৎ ঐ শাসনতন্ত্র তথা কোরআন ভিত্তিক।

মুসলমান জাতির দূর্ভাগ্য যে রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর ইসলামী শাসনের এই তিনটি নিয়ামক পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ, বাক-বিতণ্ডা, যুদ্ধ-সংঘর্ষ হয়। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। মুসলমান জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধের ভিত্তিমূল এর মধ্যেই নিহিত।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সংশোধনের জন্য তাঁর বিধান অনুযায়ী অমুসলমানদের হাতে তাদের শাসন, কর্তৃত্ব দান করেছেন। ফলে অমুসলমানরা মুসলমানদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে গেল। আল্লাহ কোরআনের বিভিন্ন স্থান সহ সূরা ২৪ নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে মোমেনদের এই পৃথিবীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বেও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন–

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।"

ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে যে, যতদিন তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট বিকৃতি থাকা সত্বেও আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্ধেক পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু জাতি হিসাবে মুসলমানরা যখন রাসুল (সা.)-এর

শিক্ষা থেকে বহুদূর চলে গেল তখন আল্লাহ তাআলা শাস্তিস্বরূপ মুসলমানদের অমুসলিমদের দাস বানিয়েছিলেন। যেমন নাকি ইহুদি জাতি ব্যাপক খোদাদ্রোহিতার কারণে তাদেরকে অইহুদিদের দাস বানিয়েছিলেন। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান। কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠী যদি আল্লাহ প্রদত্ত ব্যক্তিগত, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিধি-বিধান পালন না করে তাহলে সামাজিক বিপর্যয় বিধির আওতায় সেই জনগোষ্ঠকে বিধর্মী আক্রমণকারীর দাস বানিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে এই সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ আক্রমণকারীর অর্থনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বা শক্তি নয়; বরং পরাজিত জাতি সত্তার আল্লাহর বাণী সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সদিচ্ছার অভাব ও তাদের আর্থ-সামাজিক উপায়-পন্থায় খোদার বিধানের ব্যাপক লংঘন, বিকৃতি ও অবৈধ প্রয়োগ। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে আরেকবার সত্য ফুটে উঠে সেটা হলো এই যে, আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে বা মোমেন বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করি না কেন। বাস্তবিক পক্ষে অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার সুবিবেচনায় আমরা তা নই। অর্থাৎ আমাদের ইবাদতের পূর্ণাঙ্গতা নাই মর্মে আল্লাহর নিকট তা অগ্রহণযোগ্য। এ কারণেই আমাদের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে–

(১) পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান জাতি রয়েছে তার মধ্যে আমরা নিকৃষ্টতম।

(২) আমাদের ছাড়া আর যে কয়টি জাতি রয়েছে তারা সকলেই পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলমানদের অপমানিত, অপদস্থ করছে। মুসলমানদের আক্রমন করে হত্যা করছে, ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, তাদের উপর আক্রমণ করে হত্যা করছে। মুসলমানদের বাড়ি-ঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মুসলিম মা, মেয়ে, বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে সতীত্ব নষ্ট করছে। অন্য দেশের অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করছে অথচ মুসলিম শাসকরা তাদের প্রতি কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দূরের কথা এমনকি মৌখিক সমবেদনা ও সহানুভূতিও প্রকাশ করছে না। এর কারণ কি? এর কারণ- (১) ধর্মের বিকৃত শিক্ষা ও (২) আধুনিক শিক্ষা।

মুসলিম জাতিকে দাসে পরিণত করার পরও খৃষ্টান জাতিগুলোর মনে ঐ দাস জাতির সম্পূর্ণ ভয় দূর হলো না। কারণ তখনও তাদের মন থেকে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ মুছে যায়নি যে, অতীতে ঐ জাতির হাতে কতবার তারা সামরিকভাবে পরাজিত হয়েছিল। তারা জানত, যে জাতিকে তারা পরাজিত ও পদানত করেছে সে জাতির প্রচণ্ড শক্তির উৎস কোরআন ও হাদিস। এই কোরআন ও হাদিস এবং এর ভিত্তিতে তাদের নবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের

মাধ্যমেই তাদেরকে অপরিমেয় দূর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল যারা একদিন ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত তো করেছিলই, শুধু তাই নয় তাদের ইউরোপের মধ্যে অর্ধেক ঢুকে পড়েছিল। তাই এই জাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত হবার জন্য এই জাতিকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু ও নিবীর্য করার জন্য এক শয়তানি ফন্দি আটল। সেই ফন্দি হলো এই যে, সমস্ত মুসলমান দুনিয়ায় খৃষ্টানরা যার যার অধিকৃত অংশে মুসলমানদের "ইসলাম শিক্ষা" দেওয়ার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। ইংরেজরা এই উপমহাদেশে, মালয়েশিয়া, মিশরে, ইত্যাদিতে ফরাসীরা, আলজেরিয়া এবং অন্যান্য যে সব মুসলিম এলাকা দখল করেছিল সেখানে ডাচ অর্থাৎ ওলন্দাজরা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করল। হেস্টিংস ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই মাদ্রাসায় "ইসলাম শিক্ষা" দেওয়ার জন্য খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা তাদের ইংরেজীতে Orientalists বলে। তারা আন্তর্জাতিকভাবে বহু গবেষণা করে একটি "নতুন ইসলাম" দাঁড় করালো, যে ইসলামের বাহ্যিক রূপ বা চেহারা ইসলামের মতই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মেও বিশ্বাস, আকীদা বা আমল অর্থাৎ সার্বিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড 'সিরাতুল ইসলামের' সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীতমুখী "ইসলাম শিক্ষা" দিতে কিছু বিষয়বস্তু বাদ দিতে হবে। কেমন করে শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ এক কথায় এই ইসলামের সিলেবাস এবং কারিকুলাম নির্ধারণ ও স্থির করলো খৃষ্টান পণ্ডিতরা। এই পাঠ্যক্রমে প্রথম ও প্রধান পরিবর্তন করা হলো কালেমার অর্থ ও তাৎপর্যকে অর্থাৎ লা-ইলাহা অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক।

তাওহীদ ও সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে আল্লাহর উলিহিয়াতকে ব্যক্তি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলো। কারণ সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশের, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার কনসেপ্ট স্বীকার করা হলে ইংরেজদের রাজত্ব করাই বিপদজনক। তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অর্থাৎ তাওহীদের পরেই স্থান হলো "ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধের" এক্ষেত্রে ইংরেজদের রাজত্ব পরিচালনার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো অসততা, তথা মিথ্যাচার, অন্যায় যুদ্ধ, ঘুষ আর সমস্ত ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থি কার্যক্রম। এই সব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধান বাদ দিয়ে সমষ্টিগত, জাতিগত বিষয়গুলোকে নিম্নস্তরে নামিয়ে অতি সাধারণ ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে অতি গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য দেওয়া হলো– শুধু নামাজ, রোজা, বিয়ে-শাদী, তালাক, দাঁড়ি-টুপি, পাজামা-পাঞ্জাবী, মেসওয়াক-কুলুপ,

অযু-গোসল ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ইসলামের অতি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উপরে স্থান দেওয়া হলো। ব্রিটিশ প্রণীত এই পাঠ্যক্রমে আরো প্রাধান্য দেওয়া হলো সে সব বিষয়গুলো সম্বন্ধে মুসলিম জাতির কলঙ্ক হিসাবে বিভিন্ন মতভেদ ও বিতর্ক আগে থেকেই মজুদ ছিল বা আছে। খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা এটা করলেন এই জন্য যে, তাদের দেখানো ইসলামের আলেমরা যেন এগুলো নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি, বাহাস ও প্রয়োজনে মারামারি করতে থাকে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে এবং তাদের শাসন নিরাপদ হয়। আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের বানানো ইসলাম শিক্ষা দিতে কোথাও যেন বাঁধা না আসতে পারে সে জন্য মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা সহ অধ্যক্ষ পদটি তারা ইংরেজদের জন্যই সংরক্ষিত রাখলো। আর এই মাদ্রাসাটির প্রথম অধ্যক্ষ হলেন Dr. A. Springer, M.A| ১৭৮০ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত এই ১৪৬ বছরে একাধিকক্রমে ২৬ জন খ্রিস্টান পণ্ডিত মুসলমান ধর্মালম্বীদের ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর ১৯২৭ সালে Mr. Alexander Hamilton Hantry অধ্যক্ষ পদ শামসুল উলেমা, কামাল উদ্দিন আহমদ, এম.এ, আই আই এস এর হাতে তা ছেড়ে দেয়।

ইংরেজরা চলে গেছে কিন্তু তাদের তৈরী করা ইসলাম আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই মাদ্রাসা থেকেই ঐ ইসলাম শিখে আলেমরা বের হচ্ছেন এবং আমাদের সেই তথাকথিত ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা আজ সেই ইসলামকে বুঝি যে ইসলাম এই খ্রিস্টান পণ্ডিতরা শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক জীবন পরিচালিত হচ্ছে খ্রিষ্টানদের তৈরী নানা রকম তন্ত্র/বাদ (Ism/Cracy) দিয়ে আর ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর ইসলাম দিয়ে নয়। এরপরেও আমরা নিজেদেরকে মোমেন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং পরকালে আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা ও পুরস্কার আশা করতে দ্বিধা করি না।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য আমাদের দেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য লর্ড ম্যাকলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা জানলে বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা যাবে। তিনি বলেন– "আমি সমস্ত ভারতবর্ষের এই প্রান্ত হইতে ঐ প্রান্ত ভ্রমন করিয়া একজন ভিক্ষুক বা তস্কর দেখিলাম না। এই দেশে সম্পদের এত প্রাচূর্য এবং ব্যক্তি মানুষের বিবেক, জ্ঞান, মনন ও যোগ্যতা এত উন্নত যে তাহাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ঐতিহ্যের মেরুদণ্ড ভঙ্গ করতে না পারলে

আমার ধারণা এই জাতিকে পদানত করা সম্ভব নয়। আমার প্রস্তাব এই দেশের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা, ইহার সংস্কৃতিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা হোক যাহাতে ভারতীয়রা বিশ্বাস করে যাহা কিছু বিদেশী এবং ইংরেজদের তৈয়ারী তাহাই উত্তম। ইহাতে তাহাদের জাতঅভিমান হারাইবে, তাহাদের স্বীয় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ হারাইবে এবং একটি প্রকৃত দাস জাতিতে (A truly dominated nation) এ পরিণত হইবে। ঠিক যেমন আমরা চাই।"

একটি জাতিকে নির্জীব, দাস, হতদরিদ্র বানিয়ে ফেলার কি নিষ্ঠুর ও অনৈতিক ষড়যন্ত্র। আজও সেই ষড়যন্ত্রেও ঘানি টেনে বেড়াচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সহ সমগ্র বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দ শিক্ষার গোলামী, রাজনৈতিক দাসত্ব, অর্থনৈতিক দাসত্ব, সাংস্কৃতিক গোলামী বর্তমানে ব্রিটিশ যুগের চেয়ে শত শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষের কোনো স্বপ্নও নাই। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা ম্যাকলে ভারতের মানুষদের যে চরিত্র ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেছেন তার মূল কারণ ছিল পাঁচশত বছরে মুসলিম শাসন। যদিও এটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন ছিল না। আর ম্যাকলে যে শিক্ষিত ভারতীয় শ্রেণি তৈরী করতে চেয়েছেন তার রূপরেখা তিনি নিজেই বলেছেন– "এই মুহূর্তে অবশ্যই আমরা এমন একটা শ্রেণি গড়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব যারা হবে যে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা শাসন করি। তাদের আর আমাদের মধ্যে দোভাষী এমন এক শ্রেণীর মানুষ যারা হবে রক্তে গায়ের রঙ্গে ভারতীয়। কিন্তু মতামত, নৈতিকতা আর বিচার-বুদ্ধিতে ইংরেজ।" [Thomas Babington Maculay minitute on the Indian Education 2 February, 1835]

ম্যাকলের এই নীতি যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছিল তার প্রমাণ হলো ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতরা নিজ দেশের স্বার্থ চিন্তা না করে ইংরেজ সরকারের স্বার্থ রক্ষা করে চলতো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তারা ইংরেজদের প্রতিটি শোষণমূলক পদক্ষেপ, দেশের শিল্প ধ্বংস, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ধানের বদলে নীল চাষ, বিলেতী পণ্যের বাজার সৃষ্টি, দেশের অর্থ বিদেশে পাচার। সকল প্রকার অন্যায় কাজের নৈতিক সমর্থন দিয়ে এসেছে। এই শিক্ষিত শ্রেণি এমনকি ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন মুসলমানদের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই শিক্ষিত শ্রেণিটি তখন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইংরেজদের দালাল হিসাবে কাজ করেছে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দালালী কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উক্তিতে জানা যায়। তিনি লিখেছেন– "আমাদের যদি

জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমরা ইংরেজ অথবা অন্য সরকারের মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ করি? তাহলে এক বাক্যে বলব যে, সর্বোতভাবে আমরা ইংরেজ সরকারকেই পছন্দ করি। এমনকি যদি হিন্দু সরকার হয় তার থেকেও।" [Daily Reformer, July, 1931]

আমরা আগেই বলেছি সব ধর্মের মূল শিক্ষা 'তাওহীদ', সেই তাওহীদ সর্বব্যাপী, মানুষের জীবনের সর্বস্তরের সমস্ত অঙ্গনের তাওহীদ। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আইন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি সবকিছুর উপর তাওহীদ। এই তাওহীদের প্রধান অংশ হলো 'রেসালাত'। কারণ মানব সৃষ্টির বিধান অনুযায়ী আল্লাহর খলিফা হিসাবে মানুষ অর্থাৎ নবী-রাসুল ও তারপরে তাঁর প্রকৃত ও বৈধ উত্তরাধিকারী 'আহলে বাইত'। তথা আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মহান ব্যক্তিবর্গ। কোরআনের বৈধ ব্যাখ্যাকারী হিসাবে আল্লাহর এই দ্বীনে বা প্রাকৃতিক জীবন বিধান তথা ধর্ম পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বে নিয়োজিত আর মানুষ তাঁদের কথা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করে এই মতাদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে ও তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্ট চালাবে। বর্তমান ইংরেজদের শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম শ্রেণি ও আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বৃহত্তর ও সমষ্টিগত ভাবে আল্লাহর এই সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার ও মান্য করছে। তাই এই ধারণা প্রকৃতপক্ষে কার্যত আল্লাহকে অস্বীকার করার সামিল যা কোরআনের ভাষায় 'গায়রুল্লাহ'র ইবাদত বা তথা শিরক ও কুফর। কারণ পাশ্চাত্যের শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে বলা হয়েছে রাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে 'রাজা-বাদশাহর'। ফ্যাসিবাদের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে 'ডিক্টেটরের' অর্থাৎ 'একনায়কের'। সমাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে এক শ্রেণির 'ডিক্টেটরশীপ'। গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের'। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে মানুষের হাতে তুলে নেবার পর সংবিধান, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরী করে মানব জীবন পরিচালনা আরম্ভ হলো। যার নাম হলো 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র'। এই গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রইল সংখ্যা গরিষ্ঠের হাতে। মানুষ তার সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধান, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি তৈরী করতে পারেনা। যা নিখুঁত, নির্ভূল ও ত্রুটিহীন অথচ যা মানুষের মধ্যকার সমস্ত অন্যায়-অবিচার দূর করে মানুষকে প্রকৃত শান্তি (ইসলাম) দিতে পারে। কাজেই ইউরোপের মানুষের তৈরী ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তকর আইন-কানুনের ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যায়-

অবিচারের সীমা অতিক্রম করতে লাগল। বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে সুদ ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করায় সেখানে চরম অন্যায় শুরু হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় মানুষ ধণকুবের হয়ে সীমাহীন প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে গেলে অধিকাংশ লোক শোষিত ও সুবিধাবঞ্চিত হয়ে দারিদ্রের চরম সীমায় নেমে গেল। স্বাভাবিক নিয়মে ঐ অর্থনৈতিক বৈষম্য অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানুষের এক অংশ বিদ্রোহ করলো এবং গণতান্ত্রিক ধণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও এক শ্রেণির এক মালিকতন্ত্র কায়েম করলো।

অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র, ধণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ (Proletariat Dictatorship) এগুলো মানুষের এক ভুল থেকে অন্য ভুলে তথা অন্ধকারে হাতড়ানো। এক ব্যবস্থার ব্যর্থতায় অন্য নতুন আরেকটি ব্যবস্থা চালু বা প্রবর্তণ করা। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিগত জীবনের ধর্মহীনতা অবলম্বন করার পর গণতন্ত্র সহ যত তন্ত্র/বাদ (Ism/Cracy) চালু করার প্রচেষ্ট ইউরোপের মানুষেরা করেছে। সবগুলোর সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতেই ছিল। অর্থাৎ রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সমাজবাদ, একনায়তন্ত্র সবগুলোর সমষ্টি হচ্ছে বর্তমান আধুনিক সভ্যতা।

আর এর ফলে বর্তমান বিশ্বে এক শতাংশ ধনীর হাতে বিশ্বের অর্ধেক সম্পদ। তাই আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে দ্রুত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ অধিকাংশ সাধারণ মানুষের রুজি রোজগার হ্রাস পাচ্ছে এবং এর সাদামাটা অর্থ হলো পৃথিবীতে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। বিশ্ব মানব সমাজ এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। বিশ্বের অর্থনীতিতে ভয়ংকর অর্থনৈতিক মন্দা ও সংঘর্ষের আশা করছে। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক ক্রেডিট সুইস পেন্টাবাল ওয়েলথ রিপোর্ট ২০১৫ এ বলা হয় যে, বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে ধনী একাংশের হাতে আছে বিশ্বের ৫০ শতাংশ সম্পদ। আর ৫০% দরিদ্র মানুষের হাতে আছে মাত্র ১% সম্পদ। বৈপরীত্যের মাত্রা ছিল পিলে চমকানোর চেয়ে বেশী। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এমন বৈপরীত্য দেখা যায়নি। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন মুদ্রামানের ব্যাপক তারতম্য ঘটায় অর্থাৎ ডলারের বিপরীতে অনেক দেশের মুদ্রার মান অবমূল্যায়িত হওয়ায় গত এক বছরের মুদ্রামান কমেছে ১২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। সম্পদ কমেছে, কিন্তু বৈষম্য কমেনি; বরং তা বেড়েছে। বরাবরের মত ধনীদের হাতে সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে। বর্তমানে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষই বেশী ধনী। তাদের হাতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সম্পদ রয়েছে। তবে সমাজতান্ত্রিক চীনের নাগরিকদের হাতেও সম্পদের পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

অঞ্চল ওয়ারী হিসাবে দেখা যায় যে, বিশ্বের মোট প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ ১৮% বাস করেন উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে। অথচ তাদের হাতে রয়েছে বিশ্ব সম্পদের ৬৭%। এই দুই অঞ্চলে মানুষের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশী। বিশ্বের অন্যত্র পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। চীন ও ভারত ব্যতীত এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২৬% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বসবাস থাকলেও তাদের হাতে সম্পদের পরিমাণ ১৮%। চীনে বিশ্বের মোট মানুষের ২১% এর বসবাস। আর তাদের সম্পদ ৯%। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্বের ৮% লোকের বসবাস হলেও তাদের রয়েছে মাত্র ৩% সম্পদ। এদিকে ভারতেও ধনী-দরিদ্রের ফারাক অনেক বেড়ে চলেছে। এক দেশে শীর্ষ ধনী ১% লোকের হাতে রয়েছে দেশটির ৫৩% সম্পদ। প্রায় এর চেয়ে কম ধনী ১০% এর হাতে রয়েছে ৭৬% সম্পদ। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নাম আছে কম সম্পদ ওয়ালা দেশের তালিকায়। তবে এক শ্রেণির মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ রয়েছে। ২০১০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জপির অনুযায়ী বাংলাদেশের শীর্ষ মাত্র ৫% লোকের হাতে রয়েছে মোট আয়ের ৪ ভাগের এক অংশ। আর সবচেয়ে গরীবদের আয়ের পরিমাণ মোট আয়ের মাত্র .৭৮%। অর্থাৎ শতকরা একভাগেরও কম।

তাই আমরা প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ভূল ভাবে বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বে সমাজের যে ব্যাপক বিপর্যয় সাধিত হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব বিভ্রান্ত খোদাদ্রোহী একশ্রেণির মানুষের। আর খোদাদ্রোহী মানুষেরা অবশ্যই প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার হবে। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণার "পবিত্র কোরআনের আলোকে সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ" পুস্তকটি বিশ্বের বিবেকবান জনগোষ্ঠীর সুবিচারের জন্য উপহার দিলাম। যা মানুষের মুক্তির উপায় ও আমার নাজাতের ওসিলা হয় এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এই পুস্তকটি মুদ্রণের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় ভগ্নি বেগম ফরিদা মাসুদ ও রওশন আরা আমজাদ ও আমার কনিষ্ঠভ্রাতা ফরহাদ চৌধুরী যে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তার জন্য তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাই। এই বইটি লেখার সময় সার্বিকভাবে সহযোগিতা

করেছেন আমার ধর্মপত্নী নাদিরা মোমিন ও আমার দুই কন্যা রাইসা আফরিন চৌধুরী ও ছাবেরা তাহসীন চৌধুরী। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই খোন্দকার আলী কামরান আল জাহিদ, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক; আল্লামা শায়েস্তা খান আল আযহারী ও আমার সহপাঠি ও বন্ধুবর মেজর আবুল হোসেন (অবঃ)।

জনাব শাহজাহান আলী ও জনাব শাহবাজ আহম্মেদ পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে যে অশেষ সাহায্য সহযোগীতা করেছেন সেজন্য তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। আল্লাহতায়ালা এজন্য তাঁদের ইহলোক পরলোকের কল্যাণ দান করুন। আমিন। সুম্মা আমিন।

নভেম্বর ৩০, ২০১৫ ঈসায়ি।

ভূমিকা

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ধ্বংসাত্মক বিষয়াদির রহস্য উদঘাটন প্রামান্য তথ্য-উপাত্তবিহীন এক ধরনের বুদ্ধিজীবী দাবি করে থাকেন যে, এই বিশ্ব সৃষ্টিতে কোনো কর্মপরিকল্পনা বা স্রষ্টা নাই; বরং কোনো ধরণের কার্য-কারণ ছাড়া এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে! তারা অজ্ঞতাবশত ধারণা করে থাকে পৃথিবীতে হঠাৎ করে জন্ডিস, মহামারী বা বৃক্ষের পাতা শুকিয়ে যাওয়া বা ফসলের ধ্বংস বা ক্ষতি, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপালের আবির্ভাব, ভূমিকম্প, টর্নেডো, সুনামি, ঝড়, প্রলয়ংকারী ঝড়, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কোনো কার্য-কারণ নাই। তারা পৃথিবীর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব যাকে শৃঙ্খলার অদৃশ্য প্রতীক হিসেবেই দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের বৃহদাংশ স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেন, তাকে বিনা যুক্তিতে অস্বীকার করার জন্য এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করে থাকে।

ঐ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যদি বিশ্বের কোনো সৃষ্টিকর্তা বা মহা পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব না-ই থাকে, তাহলে এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহাবিপদ হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়না কেন? যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনা কেন? পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়না কেন? সূর্যোদয় বন্ধ হয়ে যায় না কেন? সকল নদী, সাগর পানির উৎস শুকিয়ে যায়না কেন? বাতাস কেন স্থির হয়ে যায় না? সমুদ্রের ঢেউ বা বন্যা সমস্ত পৃথিবীকে ডুবিয়ে ফেলে না কেন? এই ধরণের ঘটনা প্রতিরোধ করেন কে? আর এ সবের পিছনে পরিকল্পনাকারীই বা কে?

যদি বলা হয়, এই পৃথিবীর কোনো পরিকল্পনাকারী বা সৃষ্টিকর্তা থাকত, তাহলে ভয়াবহ পঙ্গপালের মাধ্যমে শস্য ধ্বংস হয়ে মানবজাতির এক বড় ক্ষতি হতোনা, অথবা মহামারীর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল মৃত্যু সংঘটিত হতোনা, শিলাবৃষ্টিতে বা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক শস্যহানির ঘটনা ঘটত না। এ গুলো বাস্তব সত্য ঘটনা। কেন এই বিশ্বের ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলী এমন পর্যায়ে যায় না, যার ফলে সবকিছু উলট-পালট হয়ে সমগ্র বিশ্ব একটি মহা ধ্বংসসস্তুপে পরিণত হয়। কেনই বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সমগ্র পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না? অথবা বাতাস স্থির হয়ে পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীকুলকে একযোগে ধ্বংস করে ফেলে না!

কেন এই ধরনের মহা মহা বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেনা? এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোথা থেকে আরোপিত হয়? এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রক রয়েছেন। যিনি এই বিশ্বের সবকিছু উলট-পালট হোক বা সমস্ত প্রাণীকুল ধ্বংস হোক বা এই পৃথিবী সর্বিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, তা চান না বা তা করেন না। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিতে যে বিপর্যয় ঘটে থাকে তা মানুষের কাজের সামগ্রিক ফল। যা আসলে মানবজাতির জন্য সতর্কবার্তা। এরই ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় মাঝে মাঝে সংঘটিত হয় আবার কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই সব পার্থিব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পৃথিবীকে মহা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করা হয়, অর্থাৎ এই সব ধ্বংসলীলা এমন ব্যাপক আকারে হতে দেয়া হয় না, যার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে মানব ও প্রাণীকুলের সামগ্রিক অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। এই সব ধ্বংসলীলা সীমিতভাবে এবং ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপক মাত্রা কমিয়ে সময়ে সময়ে সংঘটিত করা হয় যাতে মানবজাতি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন ও নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারে। এগুলি স্রষ্টার বিশেষ দয়ায় অর্থাৎ 'রহমান' গুনের বদৌলতে অল্প সময় পরেই শেষ হয়ে যায়।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ ও নাস্তিক ব্যক্তি এ ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কার্য-কারণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে এর প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, যদি কোনো দয়াময় স্রষ্টা এই বিশ্ব সৃষ্টি করতেন, তাহলে তিনি মানব জাতির জন্য এই ধরনের বিপর্যয়কর ঘটনার অবতারণা করতেন না। এই যুক্তি-তর্কের অবতারণার মাধ্যমে তারা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, এগুলি সব তথাকথিত প্রকৃতির খেয়াল বা অর্থহীন, যার নাই কোনো তাৎপর্য বা রহস্য, অর্থাৎ মানব জীবনে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি-স্বস্তি হওয়াটাই তাদের বিবেচনায় সঠিক কর্ম পদ্ধতি বা জীবনাচার। যদি তাই হতো তাহলে মানুষের গর্ব-অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা এমন পর্যায়ে চলে যেত, যা তাদের ধর্মীয় বা পবিত্র জীবন যাপনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতোনা, অর্থাৎ সে কোনো ধরনের ধর্মীয় বিধি নিষেধ বা নীতি-নৈতিকতার ধার ধারতোনা। যেমন দেখা যায়, সেই মানুষ যারা বিলাসবহুল ও আরাম-আয়েসের জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাদের মানবীয় দুর্বলতার কথা ভুলে যায় যে তারা অন্যের দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছে। তারা এও ভুলে যায় যে, তাদের কোনো দৈহিক বা মানসিক আঘাত লাগতে পারে বা তারাও কোনো

ধরনের বিপদ বা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এমনকি তারা এও ভুলে যায় যে, তাদের মধ্যে যারা গরীব তাদের প্রতি তার সহানুভূতিশীল, বা তাদের সাহায্যে তার এগিয়ে আসা উচিত। অন্যের দুঃখে কাতর বা তাদের সমস্যা সমাধানে তারও যে ভূমিকা থাকা উচিত, একথা সে বিবেচনায়ই আনে না।

যখন তারা নিজেরা বিপদে পড়ে যখন দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা তাকে গ্রাস করে তখনই কেবল তারা যুক্তির বা মানবতার পথে অগ্রসর হতে সম্মত হয়। তখনই কেবল তারা এমন ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে পড়তে পারে। যদিও এই অবস্থা হওয়ার পূর্বে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব পোষণ করত। যদি তারা বিপদগ্রস্ত না হতো তাহলে তারা নিজেরা নিজেদের এক ধরনের ঈশ্বর হিসাবে ভাবতে ভালোবাসত এবং গর্ব ও অহঙ্কারে তাদের জীবনপাত করত। তাদের অধীন বা সমাজের হতদরিদ্র, গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করত না। এই ধরনের জীবনাচার বা চিন্তাধারা পৃথিবীর কোনো ধর্মের জন্য সহায়ক ও স্রষ্টা নির্দেশিত বা মনোনীত জীবনাচরণ পদ্ধতি বা ধর্মীয় বিশ্বাস হতে পারে? অবশ্যই নয়।

এক ধরণের বিকৃত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তারা পার্থিব ক্ষতির সম্মুখীন হতো। ফলে জনগণ তাদের ঘৃণা করত, তাদের সামাজিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করত। এই ধরনের হীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের সকল ক্ষেত্রে তথা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি করত তা অবধারিত। এই বিষয়াদি যারা অস্বীকার করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়কে অর্থহীন মনে করে, তারা হলো সেই ধরনের শিশুদের মতো যারা তিক্ত ঔষধকে অপছন্দ করে বা খাওয়ার ব্যাপারে যে বিধি-নিষেধ থাকা উচিত তা কার্যত অস্বীকার করে। তারা উৎপাদনশীল কাজ করতে ঘৃণা বোধ করে আর শুধু খেলাধুলাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করে। অসম্ভব কাজ করতে আগ্রহ দেখায়। কোনো ধরনের বাঁধন ছাড়া পান-ভোজন ও কু-অভ্যাসগুলি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয় ত্বরান্বিত করে, প্রকৃতপক্ষে কিছুদিনের জন্য এই তিক্ত ঔষধ সেবন তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো।

প্রকৃতিবাদী বা খোদাদ্রোহীরা এটাও দাবি করে যে, মানুষকে যদি গুনাহ থেকে মুক্ত রাখা হতো, তাহলে তাদেরকে এতো কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো না। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সেক্ষেত্রে মানব জাতির জন্য কোনো কৃতিত্ব বা পুরস্কারের বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য ছিলো না। এরপরও তারা বলে

মানব জাতির জন্য নিরবিচ্ছিন্ন আরাম-আয়েসের জীবন নির্ধারণ করা হতো, তাতে কি ক্ষতি হতো যদি তাদের পুরস্কার ও কৃতিত্বের বিষয়টি তাদের সততার উপর নির্ভরশীল থাকত।

যদি কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক লোকের নিকট এই প্রস্তাব করা হয় যে, সে অলসভাবে বসে থাকবে, তাহলে তার সব ধরনের অভাব পূরণ করা হবে। সেই ব্যক্তির নিকট এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে কি? বরং সেই ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় যা কিছু অর্জন করবে তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে কিন্তু বিনা চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে ব্যাপক কিছু প্রাপ্তিও সে সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করবে না। এ কারণেই পারলৌকিক জগতের পুরস্কার সেই ব্যক্তিরই প্রাপ্য হবে যা সে নিজ চেষ্টায় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই মানবজাতির জন্য দুই ধরনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। প্রথমত: এই দুনিয়ায় তার চেষ্টা-সাধনার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: তার কোনো পথে নিজ চেষ্টায় যে সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করতে পারে? সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তিই বিনা প্রচেষ্টায় কিছু অর্জন করা পছন্দ করেনা। পক্ষান্তরে তার ব্যক্তিগত চেষ্টায় যা অর্জন করে তাই সে মহামূল্যবান বলে মনে করে। তাই মহান আল্লাহতালার দয়া ও করুণায় যা তাকে দান করা হয়, আল্লাহ নির্ধারিত উপায় ও পন্থায় কাজ করে সে তা যদি অর্জন করতে সক্ষম হয়, তাতেই সে অধিকতর সন্তুষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে, তার লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ না করে বা সকল ধরনের অবৈধ কাজ না করে যদি পর জগতে তার জন্য কোনো পুরস্কার নির্ধারণ করা হতো সেক্ষেত্রে সেই পুরস্কার তার জন্য সংগত কারণে তা অতি মূল্যবান বা আকর্ষণীয় হবেনা। এ কারণে দুঃখ-কষ্ট ও অপার সাধনার মাধ্যমে অর্জিত পুরস্কার তার জন্য অধিকতর মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হতে বাধ্য।

যদি বলা হয় যে, কিছু লোক কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই পুরস্কৃত হতে খুশি হবে, সেক্ষেত্রে যারা স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরজগতে পুরস্কার অর্জন করতে চায় তাদের কি হবে?

এই বিষয়ের সঠিক উত্তর হচ্ছে যদি কোনো লোক এ মর্মে নিশ্চিত হয় যে, বিনা প্রচেষ্টায়ই তারা পরকালে পুরস্কৃত হবে, তাহলে সব ধরনের অসৎ ও অবৈধ, নীতিহীন ও পাপাচারে তারা নিয়োজিত হবে। অর্থাৎ তাহলে কোনো ব্যক্তি নীতি বজায় রেখে পুণ্যকাজে ব্রতী হয়ে পরকালের পুরস্কার অর্জনে সচেষ্ট থাকবে? সেক্ষেত্রে অন্যের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি সংরক্ষণে কোনো ব্যক্তিই সচেষ্ট থাকবেনা। কারণ, তার পরকালের কোনো ভীতিকর আযাবের ভয়ের চিন্তাই থাকবে না। ফলে কেয়ামতের পূর্বে সমাজের দুর্বল জনগোষ্টির

উপর যে অবর্ননীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ফলে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার বা সৎ জীবনযাপনের প্রচেষ্টা সমাজ থেকে তিরোহিত হবে এবং এই বিষয়গুলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। স্রষ্টার মহাপরিকল্পনার মধ্যে এই ধরণের অনাসৃষ্টি বা উল্টা-পাল্টা চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটলে সামাজিক অনাচার ও ব্যভিচারের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

ধর্মদ্রোহীরা অনেক সময় বলে থাকে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক বিপর্যয়ে অনেক সময় নিরীহ, সৎ বা ভালো মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার দুষ্কৃতিকারীরা নিরাপদ থাকে, দয়াময় স্রষ্টার এটি কোনো ধরনের বিচার বা কর্মপন্থা, এটা সত্যিই যে, বিপদাপদ সৎ ও অসৎ ব্যক্তি উভয়ের উপরই আপতিত হয়। আল্লাহতালার মহা পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তা উভয় শ্রেণির লোকদের জন্যই উপকারী সাব্যস্ত হয়।

ন্যায়বান বিপদের সম্মুখীন হলে তা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধৈর্যধারণের শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে তারা আল্লাহর অধিকতর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অসৎ বা দুষ্কৃতিকারীরা বিপদগ্রস্ত হলে তারা খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয় ফলে সমাজে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসে। আবার তাদেরও তওবা করার বা সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও বহু প্রকার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। যেমন ঝড়ে গাছ পড়ে গেলে একজন কাঠমিস্ত্রি তা তার প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে। বন্যার সঙ্গে পলিমাটির মাধ্যমে মাটির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে ভালো ফসল পাওয়ার পথ সুগম হয়। কেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় ঘটে এর সবচেয়ে সরল উত্তর হলো মানুষের সংশোধন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, বেশি বেশি আল্লাহকে ডাকার সুযোগ সৃষ্টি ও আল্লাহর বিধানের কাছে ব্যক্তিগত চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ অর্জন।

কুরআনের আলোকে সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা খোদায়ী গজব

সেই মহান আল্লাহ তা'লার প্রশংসা দিয়ে শুরু করছি যিনি আদি-অন্ত ও গোপনে-প্রকাশ্যে চির বিরাজমান। যিনি বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করে ভারসাম্য দান করেছেন। তার পরিমাপ ও পরিমান স্থির করে এর অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহতালার সুনির্বাচিত প্রেরিত নবী মোহাম্মদ (দ.) এবং তাঁর আহলে বাইতের প্রতি দরূদ ও সালাম জানাই। রাসূল (দ.)-এর উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত পথের অনুসারীগণ সত্যিকারের পথের সন্ধান পায় ও যাঁর অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হলে তাকে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস হতে হয়। যিনি সত্যবাদী, সত্যভাজন, সাংসারিক বিলাস ব্যসনের উর্ধে থেকে তাঁর পরম বন্ধু আল্লাহ তা'লাকেই প্রত্যাশা ও কামনা করেছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যাঁর আগমনে সত্যের প্রকাশ ঘটেছে ও মিথ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ দরূদ, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সুগভীর শুভেচ্ছা জানাই। এই নবী (দ.)-এর প্রকৃত সাহাবা ও তাঁদের অনুগামী তাবেঈন বা অনুবর্তীদের প্রতিও সালাম ও অভিনন্দন জানাই। যাঁরা নিজেদের প্রভু আল্লাহতা'লার প্রতি কায়মনোবাক্যে সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর নির্দেশিত মত, পথ ও পন্থা অনুসরণ করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'লা এই বিশ্বকে এক গভীর রহস্যময়, জটিল ও অতিসূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি এ কারণেই অবলম্বন করা হয়েছে যেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত প্রখর বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে তার প্রিয় স্রষ্টাকে আবিষ্কার করে তার সঙ্গে মিলিত হয়। মহান স্রষ্টার প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে পারলেই সে পৃথিবীতে তার নিজের ভূমিকা, মান-মর্যাদা, দায়িত্ব-কর্তব্য সার্বিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। কৌশলী বিশ্ব প্রতিপালক মানুষকে বৃহত্তর রহস্যের অংশ হিসাবে আল্লাহতা'লাকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, প্রভু, শাসক বিবেচনা করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। আবার তাকে বিপরীত কর্মপন্থা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। এই দুটি পথের যে কোনো একটি অবলম্বন করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহতা'লা প্রত্যেক জাতি ও কওমের কাছে নবী-রাসূল এবং তাঁদের সম্মানিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে মানুষকে

আল্লাহতা'লার সার্বিক পরিচয়, ক্ষমতা, সৃষ্টি রহস্য, ও পার্থিব জীবন যাপন করার উপায়-পন্থা, বিধি-নিষেধ শিক্ষা দিয়েছেন। সঠিক পথে চলার যে স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে মহান আল্লাহ তা'লা এই পথে চলার বিভিন্ন উপকারিতা ও মঙ্গলময় দিক বর্ণনা করে তাকে এই পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। অপর দিকে ভ্রান্ত পথে চলার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে সে পথে চলা থেকে বিরত রাখার পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন।

এই দুইটি পথ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ
وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ
وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَينِ
فَلاَ ٱقتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ
وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ
فَكُّ رَقَبَةٍ
أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ
يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ
أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ
ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ
أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ
وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

"আমি কি তাহাকে দুইটি চক্ষু, একটি জিহ্বা এবং দুইটি ওষ্ঠ দেই নাই? আর উভয় সৃষ্ট পথ কি তাহাকে দেখাই নাই? কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটি পথ অতিক্রম করার সাহস করে নাই। তুমি কি জানো সেই বন্ধুর ঘাঁটি পথ কি? কোনো গর্দান দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করা; কিংবা উপবাসের দিনে কোনো নিকটবর্তী ইয়াতিম বা ধুলিমলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। সেই সঙ্গে শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে। যাহারা পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণের ও (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। এই লোকেরা ডানপন্থী। আর যাহারা আমার আয়াতসমূহ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বামপন্থী। তাহাদের উপর আগুন একেবারে বেষ্টনকারী হইয়া থাকিবে। [সূরা ৯০ বালাদ, আয়াত-৮-২০]

অর্থাৎ আমি (আল্লাহতা'লা) কি তাহাকে (মানুষকে) জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির উপায়-উপকরণ দান করি নাই? মানুষকে দুইটি চক্ষু দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত মানুষ যদি তার চক্ষুদ্বয় উত্তোলিত করিয়া তাকায়, তাহলে সে তার চারপাশে প্রকৃত সত্য নির্দেশকারী উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখতে পাবে। সে সত্য তাকে ভুল-নির্ভুল সঠিক-বেঠিক এর পার্থক্য বুঝিয়ে দিবে। আর জিহ্বা ও ওষ্ঠ বলিতে কেবল বাকযন্ত্র বুঝায় না; বরং এর মাধ্যমে বাকশক্তি সম্পন্ন সত্তা বুঝানো হইয়াছে। এই "সত্তা"ই জিহ্বা ও ওষ্ঠের পিছনে থেকে চিন্তা ও অনুধাবন করার কাজ করে এবং নিজের চিন্তা ও অনুধাবনের ফল সে এই জিহ্বা ও ওষ্ঠের সাহায্যে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহতা'লা মানুষকে কেবল চিন্তা ও বিবেকশক্তি দান করেই ক্ষান্ত হন নাই যার দ্বারা সে নিজের ইচ্ছা ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে নিজের জীবন চলার পথ তালাশ করে নিবে; বরং মানুষকে আল্লাহ তা'লা স্বয়ং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, ভালো-মন্দ, নেকী ও বদি, সৎ ও অসৎ উভয় পথ-ই তাকে সৃষ্টি করে জানিয়ে, চিনিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন এ সবের প্রেক্ষিতে সবকিছু ভেবে-চিন্তে ও বুঝে-শুনে নিজের দায়িত্বে যে পথ ইচ্ছা গ্রহণ ও বর্জন করতে পারে। সূরা "দাহর"-এ বিষয়টি পুর্নব্যক্ত করা হয়েছে–

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً
إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً

"আমি মানুষকে এক মিশ্রিত শুক্রকীটের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। (এজন্য যে) তাহার পরীক্ষা লওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আমি তাহাকে শ্রবণ ও দর্শনশক্তি সম্পন্ন বানাইয়াছি। আমি তাহাকে পথ দেখাইয়াছি– হয় সে শোকর আদায়কারী হইবে; কিংবা হইবে কুফর পন্থী।"

[সূরা ৭৬ দাহর, আয়াত-২-৩]

অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহতা'লা মানুষকে যে পথ দেখিয়েছেন একটি উপরের দিকে গেছে। এ পথটি অতি দুর্গম ও বন্ধুর। এই পথে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে হয়। এই পথের পথিককে নিজের প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও শয়তানী লোভ-লালসার সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করতে হয়, তাছাড়া সামাজিক, বংশগত, বর্ণগত কৌলিণ্য ইত্যাদিও রয়েছে। অন্য পথটি খুব সহজ। কিন্তু তা নিচের দিকে গজবের মূলে চলে গেছে। এই পথে চলার জন্য কোনো প্রকারের শ্রম, ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হয়না। এই জন্য শুধু প্রবৃত্তির বাঁধনকে ঢিলা করে দেওয়াই যথেষ্ট। অতঃপর এই পথের পথিক মাত্রই নিচের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ তা'লা মানব জাতিকে উভয় পথই

দেখাইয়াছেন, এখন যে এই কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বনে ব্যর্থ হলো সে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ধংসপ্রাপ্ত হলো।

কোনো গলা থেকে দাসত্বের শৃংখল মুক্ত করার তাৎপর্য হলো আর্থ-সামাজিকভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত, নির্যাতিত ব্যক্তির জন্য অর্থব্যয় করা, কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে ঋণ হতে মুক্ত করা, নিরুপায় ব্যক্তিকে জীবিকার উপায় করিয়া দেয়া। অনুরূপভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানো- সে আত্মীয়-ইয়াতীম হোক কি প্রতিবেশী-ইয়াতিম বা দারিদ্র নিপীড়িত ও অসহায় ধুলিমলিন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দান। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সূরা ১০৭ মাউনের বঙ্গানুবাদ বিবেচনাযোগ্য –

أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

"আপনি কি সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছেন যে দ্বীনকে (ইসলাম ধর্ম) অস্বীকার করে। (সেই ধর্ম অস্বীকারকারী ব্যক্তির পরিচয় হলো) এই তো সেই ব্যক্তি যে নিরীহ, অভাবী, এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়। মিসকীনকে খাবার দিতে সে অন্যদের উৎসাহ দেয় না। মর্মান্তিক দুর্ভোগ রয়েছে সেই সব নামাজীদের জন্য। যাহারা তাহাদের সালাত (ধর্ম বিশ্বাসীদের নামাজ ও এই ধরণের নামাজীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে) সম্বন্ধে উদাসীন। যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে এবং গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।"

পবিত্র কোরআনের সূরা ০২ বাকারার ১৭৭ নম্বর আয়াতের মুত্তাকীর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা হলো–

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ
مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى
ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ
ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে (আনুষ্ঠানিক নামাজ) কোনো পূণ্য নাই; বরং পূণ্য তো তারই জন্য যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাকুল (আল্লাহর ঐশী) গ্রন্থসমূহ এবং নবীগণকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, দরিদ্র ও নিঃস্ব, অসহায় পথিক, ভিক্ষুক এবং দাস-দাসীদের মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করে এবং (প্রকৃত) নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তা পালনও করে এবং অভাব-অনটনে, দুঃখ-দুর্দশায় (শারীরিক ও সংকটকালে, জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধের সময়) ধৈর্য্যধারণ করে তারাই (তাদের বিশ্বাসের দাবিতে) সত্যবাদী এবং তারাই প্রকৃত মুত্তাকীন (সাবধানী ও পরহেজগার, আত্মসংযমী)।"

পবিত্র কোরআনের বর্ণিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় একজন প্রকৃত মুত্তাকী হতে হলে মৌখিকভাবে কলেমা পাঠ করলে বা আনুষ্ঠানিকভাবে গতানুগতিক পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করাই যথেষ্ট নয়; বরং তার বহুবিধ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কারমূলক দায়দায়িত্ব রয়েছে। এ সব প্রতিপালন না করা হলে তিনি আল্লাহর দরবারে মুত্তাকী হিসাবে পরিগনিত; হবেন না; বরং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

তবে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, আল্লাহর বিধান প্রতিপালন করা না হলে তার শাস্তি এই দৃশ্যমান জগতে দেওয়া হয় না; বরং তার মৃত্যুর পর থেকে কবর এবং পরবর্তী পর্যায়ে শাস্তি আরোপ করা হয়ে থাকে। এটি একটি বিভ্রান্তিমূলক ধারণা; বরং আল্লাহ এই পৃথিবী এমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর ঐশীগ্রন্থ ও তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাঁদের বৈধ প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্দেশিত জীবন-ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে সে রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও পরিবেশগত সমস্যায় পতিত হয়ে এই দুনিয়ায় জীবিত অবস্থায় অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে। যা একটি ধারাবাহিক স্থায়ী খোদায়ী বিধান –যা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হচ্ছে।

ইবাদত কি ও কেন?

এ পর্যায়ে আমরা ইবাদত কি এবং কেন তা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে– **"আমি মানব ও জ্বিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।"**

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ

"বল, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একান্তভাবে নিজের দ্বীনকে তারই জন্য নিবেদিত করো।"

[সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত-১১]

إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ আমারও রব, তোমাদেরও রব। সুতরাং তারই ইবাদত করো। এটাই সহজ সরল পথ।" [সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-৫১]

পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত নবী-রাসূল মানব জাতিকে ইবাদত কি এবং কেন এ শিক্ষাই দিয়েছেন। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলিম জাতি ইবাদত কি এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেনা তাই তাদের দুর্ভাগ্যেরও কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। এর মূল কারণ হলো এর মর্মার্থ নিয়ে বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি বা ভুল ধারণার মূল কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, আরবে যখন কুরআন পেশ করা হয় তখন প্রত্যেকেই জানত ইবাদত কি এবং তা কিভাবে করতে হয়। এ কারনেই যখন রাসূল (দ.) ধর্মের যে দাওয়াত দেন তখন তারা বুঝে-শুনেই তা গ্রহণ করেছিল আর যারা এর বিরোধিতা করেছিলো তারা বুঝে-শুনে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথেই করেছিল। অর্থাৎ কুরআন নাজিল হওয়ার সময় ধর্মের বিভিন্ন পরিভাষা অর্থাৎ ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত এ শব্দগুলোর যে মূল অর্থ প্রচলিত ছিলো পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত; বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। এর এক কারণ ছিলো আরবি ভাষার প্রতি সঠিক আগ্রহের ও জ্ঞানের অভাব।

দ্বিতীয়ত ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় যেসব অবৈধ নেতৃত্বের আবির্ভাব বা উদ্ভব ঘটেছে তাদের কাছে ধর্মের সেই আবেদন বা ব্যাপকতা ছিলনা। যা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় অমুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিলো তাছাড়া প্রকৃত ইসলাম

ধর্মীয় ব্যাপকতা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকলে এই সব দুরাচার অবৈধ ক্ষমতা দখলদারীদের ক্ষমতা গ্রহণ প্রক্রিয়া বা তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সামাজিক ন্যায় বিচার বা আধুনিক পরিভাষায় বাক স্বাধীনতা এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য হলো শাসকগোষ্ঠির ক্ষমতারোহনের উপায় পন্থা ও তাদের অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মুক্ত আলোচনা। আর এই স্বাধীনতা প্রদান করা হলে যে, তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই অসম্ভব হযে পড়ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই কারণে তদানীন্তন অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা তাদের দালাল একদল বুদ্ধিজীবী তৈরি করতে সক্ষম হয়, যারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এমন সব ব্যাখ্যা তৈরি করে যার ফলে ইসলাম ধর্ম হিসাবে পুঁজিবাদ, রাজতন্ত্র, সামরিক তন্ত্র ও অভিজাতন্ত্রের প্রতিভূ বা স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে অভিহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অভিধান ও তাফসীর গ্রন্থে অধিকাংশ কুরআনিক শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে আভিধানিক শব্দের পরিবর্তে এমন সব অর্থে যা পরবর্তীকালের মুসলমানদের সহজে বিভ্রান্ত করা যেত। যেমন 'ইলাহ' শব্দের মূল অর্থ সার্বভৌম ক্ষমতা অথচ এই শব্দকে মূর্তি ও দেবতার সমার্থক করা হয়েছে। 'রব' শব্দের মূল অর্থ শাসন কর্তৃত্ব যেমন ফেরাউন বলে ছিলো 'আনা রাব্বিকুমুল আলা' আমি কি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান দাতা নই। এই 'রব' শব্দের প্রতিশব্দ করা হয়েছে পালন/লালন কর্তা। ইবাদতের অর্থ করা হয়েছে পূজা, উপাসনা। দ্বীনের অর্থ করা হয়েছে ধর্ম-মাযহাব ও পাশ্চাত্য সংজ্ঞায় Religion এর সমার্থক হিসাবে। অথচ ধর্মের এই বিভ্রান্তিকর সংজ্ঞার মাধ্যমেই প্রকৃত ধর্মের ব্যাপক বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে 'ইবাদত' অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য, মান্যতা বা আত্মসমর্পন। আবার 'তাগুত' এর তরজমা করা হয়েছে মুর্তি বা শয়তান। অথচ তাগুতের মূল অর্থ ছিলো অবৈধ ক্ষমাতসীন সরকারের সমার্থজ্ঞাপক। এ কারণেই বর্তমানেও ইসলাম ধর্মে এতো মত বিরোধ ও বিভ্রান্তি। অন্য কথায় রাসূল (দ.) পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্ম বর্তমানে পৃথিবীতে কোথায়ও চালু নাই। অথচ পবিত্র কুরআন অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে কিন্তু তার অর্থ ও ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি সম্পর্কে সবাই দৃশ্যত নিশ্চুপ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন–

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ
عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ

خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাহাদিগকে লানত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি, তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। তুমি তাহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা দেখিতে পাও। সুতরাং উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মপরায়নদিগকে ভালোবাসনে।" [সূরা ০৫ মায়িদা, আয়াত-১৩]

এখন আমরা পবিত্র কুরআনের আলোকে ইবাদত শব্দটির প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় যখন রাজা, রাজতন্ত্র, ধর্মীয় নেতৃত্ব তথা পোপের বিরুদ্ধে বা জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে মুক্তভাবে বা উদারভাবে আলোচনা করতে সক্ষম হলো কিন্তু মুসলিম সমাজ এখন পর্যন্ত রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বা সমাজতন্ত্রের যাঁতাকলে অদ্যাবধি পিষ্ঠ হচ্ছে।

আরবি ভাষায় 'ইবাদত' শব্দটির আসল অর্থ বাধ্য হওয়া। অনুগত হওয়া। কারো সামনে এমনভাবে আত্মসমর্পন। যার অনুগত্য করা হয় তার মর্জিমতো সে যেভাবে খুশি সেবা গ্রহণ করতে পারে বা অনুগত ব্যক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। আরবি ভাষায় সর্ববৃহৎ অভিধান 'লিসানুল আরবে' এ শব্দের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার এই: এক. যে ব্যক্তি কারো মালিকানাধীন, স্বাধীন নয়, তাকে বলা হয় 'আব্দ'। এটা 'হুর' বা 'আযাদ' তথা স্বাধীনতার বিপরীত।

দুই. 'ইবাদত' বলা হয় এমন আনুগত্যকে যা পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে করা হয়।

'তাগুতের' ইবাদত করেছে, মানে তার বাধ্য-অনুগত্য হয়েছে। আমরা তোমারই ইবাদত করি মানে পূর্ণ আদেশানুবর্তিতার সঙ্গে তোমার আনুগত্য করি। তোমাদের 'রবের ইবাদত' করো অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করো। যে ব্যক্তি কোনো রাজা বাদশাহর অনুগত। সে তার আবেদ- গোলাম। অর্থাৎ রাজা-বাদশাহর ইবাদত করে।

তিন: তার ইবাদত করেছে অর্থাৎ তার পূজা অর্চনা বা উপাসনা করা।

চার: সে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে পৃথক বা আলাদা হয়নি।

পাঁচ: কোনো ব্যক্তি কারো কাছে আসতে বিরত থাকলে বলা হবে কোনো জিনিস তোমাকে আমার কাছে আসতে বিরত রেখেছে বা বারণ করেছে। অর্থাৎ আমার ইবাদত করতে তোমাকে কে নিষেধ করেছে।

এ ব্যাখ্যা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে 'আবদ' ধাতুর মৌলিক অর্থ হচ্ছে কারো কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে তার মোকাবিলায় নিজের স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করা। ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা ত্যাগ করা, তার জন্য অনুগত হয়ে যাওয়া। একজন আরবি ভাষাভাষী লোকের মনে শব্দটি যে ধারণার সৃষ্টি করে তাহলো গোলামী-বন্দেগীর ধারনা। গোলামের আসল কাজ যেহেতু আপন মনিবের আনুগত্য আদেশানুবর্তিতা। তাই কার্যত এ থেকে আনুগত্যের ধারণা সৃষ্টি হয়। একজন গোলাম বা দাস যখন স্বীয় মনিবের বন্দেগী-আনুগত্যের কেবলে নিজেকেই সোপর্দ করেনা; বরং তার বিশ্বস্ততা, শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্বও স্বীকার করে। বিভিন্ন উপায়ে তার মালিকের বা প্রভুর নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রকাশ করে। এমনি করে বন্দেগীর আনুষ্ঠানিকতা পালন করে। এর নাম পূজা-উপাসনা।

'আবিদয়াত' এর অর্থে ধারণা তখন স্থান লাভ করে, যখন গোলাম মনিবের সামনে কেবল মাথাই নত করেনা; বরং তার হৃদয় মনও অবনত থাকে। প্রকৃত পক্ষে সেজদার আনুষ্ঠানিকতার মূল ভিত্তি এর মাঝে নিহিত।

কুরআনে ইবাদত শব্দের ব্যবহার :

এ আভিধানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের পর আমরা পবিত্র কুরআনের দিকে দৃষ্টিপাত করে জানতে পারি যে, এই পবিত্র গ্রন্থে 'ইবাদত' শব্দটি সম্পূর্ণভাবে প্রথম তিনটি অর্থ– মালিকানাধীন, নিয়ন্ত্রনাধীন, পূর্ণবিনয়ের সঙ্গে কৃত আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথায়ও প্রথম দ্বিতীয় অর্থ একই সঙ্গে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, কোথাও শুধু দ্বিতীয় অর্থ আর কোথায়ও তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর কোথায়ও একই সঙ্গে তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইবাদত-দাসত্ব-অধীনতা অর্থে পবিত্র কুরআন :

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ
فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ

"অতঃপর আমরা মুসা ও তার ভাই হারুনকে আমাদের নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট প্রত্যাদিষ্টের দলীল-প্রমাণসহ ফিরাউন এবং তার সভাসদদের নিকট প্রেরণ

করলাম। কিন্তু তারা অহঙ্কার করল এবং তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়, তারা ছিলো ক্ষমতার অধিকারী কওম। তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই মতো দুজন মানুষের প্রতি ঈমান আনব? তারা এমন কওমের লোক, যে কওম আমাদের আবেদ-তাবেদার-অধীন-প্রজা।" [সূরা ২৩ মুমিনুন, আয়াত-৪৫-৪৭]

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"(ফিরআউন মূসাকে খোটা দিয়ে বলেছিলো), আমরা তোমাকে শৈশবে (নিজের কাছে রেখে লালন-পালন করেছি, মূসা তার জবাবে বলেন), তুমি আমাকে যে অনুগ্রহের খোটা দিচ্ছ, তাতো এই যে, তুমি বনি ইসরাঈলকে তোমার দাসে (আবদ) বানিয়েছো।" [সূরা ২৬ আশ শুয়ারা, আয়াত-২২]

এ দুটি আয়াতেই ইবাদত অর্থ গোলামী, দাসত্ব, অধীনতা, আদেশানুবর্তিতা। ফিরাউন বলল, মূসা-হারুনের কওম আমাদের আবেদ মানে আমাদের রাজশক্তির গোলাম, দাস, অধীন, নির্দেশের অধীন, প্রজা, রাজকীয় নির্দেশের অনুসারী, আর হযরত মূসা (আ.) বললেন, তুমিতো বনি ইসরাঈলকে তোমার আবদ অর্থাৎ অধীন, প্রজা, গোলাম বানিয়ে নিয়েছো। অর্থাৎ তাদেরকে অধীন, পরাধীন বানিয়ে রেখেছো। অর্থাৎ নিজের মর্জিমতে সেবা নাও তাদের কাছ থেকে। এই আবদের সঙ্গে উপাসনা, পূজার কোনো সম্পর্ক নাই।

ইবাদত আনুগত্য, নির্দেশ প্রতি পালন অর্থে :

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আমারই ইবাদত করো, তবে আমি তোমাদের যে সব পবিত্র জিনিস দান করেছি, তা খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো।" [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-১৭২]

ইসলাম পূর্বকালে আরবের লোকেরা তাদের ধর্মগুরু ও মুরুব্বীদের নির্দেশ অনুযায়ী খাদ্য-পানীয় বিষয়ে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ মেনে চলত। আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যদি তোমরা আমার প্রভুত্ব সত্যি সত্যি স্বীকার করে থাক তাহলে সমাজে প্রচলিত বিধি-নিষেধ লংঘন করে আমি যা হালাল করেছি তা হালাল বিবেচনা করে বিনা দ্বিধায় খাও। অর্থাৎ আমার আনুগত্য স্বীকার করে নিলে অন্য কারো প্রদত্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। সুতরাং 'ইবাদত' শব্দটি আনুগত্য তথা নির্দেশ প্রতিপালন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে পূজা-উপাসনা বা অর্চনার সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা নাই।

তাগুতের ইবাদত সম্পর্কে কুরআন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِى ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ, তাগুতিদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে।"

[সূরা ১৬ নাহল, আয়াত-৩৬]

وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ

"যারা তাগুতের ইবাদত পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের জন্য সুসংবাদ।" [সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত-১৭]

এই দুটি আয়াতেই তাগুতের ইবাদত মানে তাগুতের দাসত্ব-অনুগত্য ইতোপূর্বে আমরা সে ইংগিত করেছি। যে রাষ্ট্রক্ষমতা খোদাদ্রোহী হয় আল্লাহর জমিনে নিজের হুকুম চালায়, বল প্রয়োগ, লোভ-লালসা প্রদর্শন বা বিভ্রান্তিমূলক শিক্ষা দ্বারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আপন নির্দেশনুযায়ী করে। কুরআনের পরিভাষায় তাকেই বলা হয় 'তাগুত'। এমন কোনো ক্ষমতা নেতৃত্বের সামনে মাথানত করা। তার বন্দেগী গ্রহণ করে এই ধরনের অত্যাচারী-অবৈধ সরকারের নির্দেশ শিরোধার্য করে নেয়াই 'তাগুতের ইবাদত' করা। নবী-রাসূলদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নবী-রাসূলই তাঁদের সমসাময়িক গোত্রপতি/রাজা/সম্রাট/ সমাজপতি/অভিজাততন্ত্রের বা আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন। তার প্রধান কারণ হলো সেই শাসকগোষ্ঠী তাদের সরকারী ক্ষমতা বলে জুলুম-অত্যাচার, নিষ্পেষণের তুফান জারী করত। আর এই সব নবী-রাসূলগণ তাদের বিরোধিতা করতেন। যেহেতু আমরা নবী-রাসূলকে শুধু ধর্ম প্রচারক বলে মনে করি, তাই তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি আমরা বিবেচনাই করিনা ফলে অবৈধ রাষ্ট্রীয় শক্তি যে 'তাগুত' তা আমরা ভুলেই গেছি।

শয়তানের ইবাদত সম্পর্কে কুরআন :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيٓ آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلْشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে তাগীদ করিনি যে শয়তানের ইবাদত করোনা? কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

[সূরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াত-৬০]

জানা কথা সব সময় লোক শয়তানের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে। সুতরাং কিয়ামতের দিন বনী আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহর তরফ থেকে যে অভিযোগ দায়ের করা হবে তা এজন্য হবেনা যে, তারা শয়তানের পূজা-অর্চনা-উপাসনা করেছে; বরং তা হবে এ জন্য যে তারা শয়তানের কথা মতো চলছিলো। তার বিধানের অনুগত্য করেছিলো যে যে পথ, পদ্ধতি, উপায়-পন্থা-নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে বলেছিলো বা নির্দেশ দিয়েছিলো। সে পথেই তারা ছুটে চলেছিলো। শয়তানের অনুসারীদের পরিচিতি সহজে বুঝার জন্য পবিত্র কুরআনে কতকগুলি চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তার একটি হলো–

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"(শয়তান) সে তো কেবল তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর সে চায় যে, আল্লাহর সম্বন্ধে তোমরা যা জাননা তা বল।"

[সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-১৬৯]

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে মন্দ, অশ্লীলতা ও নগ্নতার জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে তা যে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের পরামর্শ বা কুমন্ত্রণার ফসল। উপরন্তু যত বাদ, ইজম ভুয়া দর্শন। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের কথামতো বেহেশত-দোজখ, বা পরকালের শাস্তি পুরস্কার সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তারাই শয়তানের অনুসারী। অথবা শয়তানই তাদের অভিভাবক। বা তারাই প্রকৃতপক্ষে শয়তানের পূজারী বা শয়তান উপাসক।

বিষয়টি অধিক ও স্পষ্ট বোঝা যায় পবিত্র কুরআনের এইসব বাণীতে–

ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ
مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ
قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ

"কিয়ামত সংঘটিত হলে আল্লাহ বলবেন, যে সমস্ত যালেম, তাদের সাথী ও আল্লাহ ছাড়া সে সব মাবুদদের তারা ইবাদত করতো তাদের সকলকে একত্র করে জাহান্নামের পথ দেখাও। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি

দোষারোপ করতে থাকবে। ইবাদতকারীরা বলবে যারা কল্যাণের পথে আমাদের কাছে আসত তোমরাই তো তারা। তাদের মাবুদরা (উপাস্য) জবাব দেবে আসলে তো তোমরা নিজেরাই ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিলেনা। তোমাদের ওপর আমাদের কোনো জোর জবরদস্তি ছিলনা; বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে নাফরমান।" [সূরা ৩৭ সাফফাত, আয়াত-২২-৩০]

আলোচ্য আয়াতসমূহে আবেদ মাবুদের মধ্যে যে প্রশ্ন-উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রনিধান করলে স্পষ্টত: জানা যায় যে, যেসব মূর্তি-প্রতিমা-দেবতার পূজা করা হতো বা হয়ে থাকে এখানে মাবুদের অর্থ তা নয়; বরং সে সব চিন্তাবিদ, নেতা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, মানুষের কল্যাণের আবরণে মানুষকে বিভ্রান্ত-বিপথগামী করেছে। তারা অথবা যারা পবিত্রতার লেবাসে হাজির হয়েছিল জপমালা, চাদর, আলখেল্লাহ-পাগড়ীর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের ধোকা দিয়ে যারা নিজেদের ভক্ত-অনুরক্ত করে তুলেছিলো অথবা যারা সমাজের সংস্কার সংশোধন এবং শুভানুধ্যায়ীর দাবি করে ধ্বংস, অকল্যাণ ও বিপর্যয় ছড়িয়েছে এমন লোকদের অন্ধ অনুসরণ এবং বিনা বাক্যব্যায়ে তাদের নির্দেশ মেনে নেয়াকেই এখানে তাদের ইবাদত বলে আল্লাহ আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে যে–

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَـٰهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা নিজেদের পাদ্রি ও সংসারবিরাগীদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের রব (বিধান দাতা) বানিয়ে নিয়েছিলো। এমনি করে মসীহ ইবনে মরিয়ামকেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয় নি। তিনি পবিত্র তাদের শির্ক থেকে।"

[সূরা ০৯ আত তাওবা, আয়াত-৩১]

ওলামা-মাশায়েখ, পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে রব বানিয়ে তাদের ইবাদত করার অর্থ এখানে তাদেরকে আদেশ-নিষেধের অধিকার স্বীকার করা এবং আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর অনুমোদন ছাড়াই তাদের নির্দেশ শিরোধার্য করে নেয়া। বিশুদ্ধ বর্ণনায় রাসূল (দ.) নিজেও এ অর্থ স্পষ্টত ব্যক্ত করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমরা তো কখনো ওলামা-মাশায়েখ, পাদ্রী-পুরোহিতকে পূজা করিনি। জবাবে রাসূল (দ.) বলেছেন– "তারা যে জিনিসকে হালাল জ্ঞান করেছে, তোমরা কি তাকে হালাল জ্ঞান করনি, আর তারা যে জিনিসকে হারাম করেছিলো তোমরা কি তাকে হারাম বানিয়ে নাওনি?"

জ্বিনের ইবাদত করা প্রসঙ্গে :

قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

"তারা (ফেরেশতারা) বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান, আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা জিনদের পূজা করত। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতি ঈমান রাখত'।" [সূরা ৩৪ আস সাবা, আয়াত-৪১]

এখানে জ্বিনের ইবাদত এবং তাদের প্রতি ঈমান আনার যে অর্থ সূরা ৭২ জ্বিন এর ৬ নম্বর আয়াত তার ব্যাখ্যা করছে–

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادوهُمْ رَهَقاً

"আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।"

এ থেকে জানা যায় যে জ্বিনের ইবাদতের অর্থ তাদের আশ্রয় চাওয়া। বিপদাপদ ক্ষতির মোকাবিলায় তাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করা আর তাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ তাদের আশ্রয় দান করা এবং নিরাপত্তার বিধানের ক্ষমতা আছে এমন বিশ্বাস করা।

ফেরেশতাদের ইবাদত :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهَـؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ

قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

"যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে সমবেত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন– 'এরা যাদের ইবাদত করত, তোমরাই কি তারা?' জবাবে তারা বলবে– 'সুবহানাল্লাহ। তাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? আমাদের সম্পর্কতো আপনার সাথে'।" [সূরা ৩৪ সাবা, আয়াত-৪০-৪১]

এখানে ফেরেশতার ইবাদতের অর্থ তাদের পূজা করা। এ পূজা করা হতো তাদের অবস্থান ও কাল্পনিক প্রতিকৃতি তৈরী করে। এ পূজার উদ্দেশ্য ছিলো তাদেরকে খুশি করে নিজেদের অবস্থার প্রতি তাদের অনুগ্রহ –দৃষ্টিআকর্ষণ করা এবং নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাহায্য লাভ করা।

প্রবৃত্তি পূজা সম্পর্কে কোরআন :

أَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً

"যে ব্যক্তি তার মনের লোভ-লালসাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তুমি কি তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারো?"

[সূরা ২৫ ফেরকান, আয়াত-৪৩]

অর্থাৎ মানবীয় চরিত্রের মন্দ দিক যথা লোভ-লালসা বা প্রবৃত্তিকে কিছু লোক উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং এরই অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ধরণের ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করতে আল্লাহ তার প্রিয় রাসূলকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় সূরা ৭৯ নাযিয়াত এর ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

"পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে।"

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"সেই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে এবং সেই ব্যর্থ হইবে, যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।" [সূরা ৯১ সামস্, আয়াত-৯-১০]

এই প্রবৃত্তির বিরদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হলেই আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হবে মর্মে কোরআন ঘোষণা করেছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ

"হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া থাকো। পরে তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।"

[সূরা ৮৪ ইনশিকাক, আয়াত-৬]

ইবাদত, মাবুদ শব্দগুলো পবিত্র কুরআনের আলোকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যার আলোকে আমরা জানতে পারলাম যে, প্রচলিত ইবাদত বলতে আমরা যে শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতকে বুঝে থাকি তা এক মহা অজ্ঞতা। আর এ কারণেই আমাদের ঈমানের দাবি কি, বা ইবাদত বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমরা জানতেও পারিনি। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম সম্পর্কে এই বিভ্রান্তি নিরসন করার জন্য আমাদের এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা।

কুরআনে বর্ণিত সামাজিক শান্তি

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিত, সেখানে সব দিক থেকে প্রচুর জীবনের উপকরণ আসতো। তারপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। তাই তারা যা করত তার জন্য আল্লাহ তাদের ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ গ্রহণ করালেন– তাদের কৃতকর্মের পরিনামস্বরূপ।" [সূরা ১৬ নাহল, আয়াত-১১২]

পবিত্র কোরআনের বর্ণিত আয়াত পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কোরআনে উল্লিখিত, সমাজের মানুষ খুব আরাম-আয়াসে জীবন যাপন করত, তবে এই জীবন যাপনের উপকরণসমূহ যে আল্লাহর দান তা তারা কার্যত অস্বীকার করত ফলে তারা খোদায়ী গজবের শিকার হয়। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হচ্ছে তা হলো– জীবনোপকরনের সহজ লভ্যতা এবং সে সম্পর্কে অকৃতজ্ঞতা।

যে রিজিক বা জীবনোপকরন দ্বারা মানুষ প্রতিপালিত হয় তা আল্লাহর সৃষ্টি ও দয়ার দান। কারণ মানুষের রিজিক সংগ্রহের ব্যাপারেও মানবীয় চেষ্টার অংশ শুধু এই টুকু সামিল আছে যে, কৃষক ক্ষেতে বীজ বপন করে, এরপর তার মূল ব্যাপারে ঐ কৃষকের আর কিছুই করণীয় নাই। কিন্তু যে জমিতে বীজ বপন করা হয় তাহা মানুষ সৃষ্ট নয়। এই জমিতে মৌল উর্বরা শক্তি ও যোগ্যতা কোনো মানুষ দান করে না। বীজের মাটিতে রোপনের পর এর বিকাশ দান ও প্রবৃদ্ধি লাভের যোগ্যতা মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। সেই গাছই অংকুরিত হয়, যে গাছের বীজ এই যোগ্যতা সৃষ্টিতে মানুষের কোনো হাত নাই। এই চাষাবাদ ও বীজবপনকে হিল্লোলিত চারাগাছে ভর্তি ক্ষেতে পরিণত করার জন্য মাটির ভিতরে যে কার্যক্রম এবং মাটির উপরে যে বাতাস, পানি, তাপ, শৈত্য ও মৌসুমী অবস্থার প্রয়োজন এর মধ্যে একটি জিনিসই মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি নহে। এই সবকিছুই একমাত্র আল্লাহরই লালন-পালন তথা রবুবিয়াতের বিস্ময়কর প্রকাশ মাত্র। কেবলমাত্র তারই অস্তিত্ব দানের ফলেই যখন মানুষ রিজিক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই সেই মহান রব আল্লাহ তালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর নির্দেশিত জীবন নির্বাহ করে আর সামাজিক

দায়িত্ব পালন করা মানুষের জন্য সর্বপ্রথম দায়িত্ব। এই কৃতজ্ঞতা তথা সামাজিক দায়িত্ব পালন না করা হলে; পর্যাপ্ত রিজিক প্রাপ্তির মাধ্যমে মানব সমাজে মারাত্মক অন্যায়-অবিচার ও ব্যভিচারের কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়; যা আল্লাহর বিবেচনায় সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক ঐক্যের প্রতি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। মানুষ আয়েসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অমিতাচার এবং বিলাসিতা জাতির মধ্যে আলস্য-প্রবনতার জন্ম দেয়। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামপ্রিয়তার (আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বে অবহেলা) ফলে ক্রমবর্ধিত হারে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক শৃংখলা শিথিল করে দেয়। যখনই এই ধর্ম আরোপিত সামাজিক নিয়ন্ত্রন (Social Control Mechanism) ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। তখনই মানুষের পক্ষে অন্যায়-অবিচার করা এবং দুর্বল ও শক্তিহীনদের অধিকারসমূহের প্রতি অমানুষিক অশ্রদ্ধার মনোভাব গ্রহণ করা সহজতর হয়ে পড়ে। ফলে সেই সমাজ আল্লাহর গজবের সম্মুখীন হয়।

একই মনোভাব নিয়ে যারা বিলাসী জীবন-যাপন সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা করে এবং পরিশেষে সমাজের ধ্বংস ডেকে আনে। তাদের সম্পর্কে কোরআনে সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াত-১৬ ঘোষণা করে যে–

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً

"এবং আমি যখন কোনো জনপদকে বিনাশ করতে চাই– আমি আমার আদেশ পাঠাই উহার সম্পদশালী (আয়াসী) লোকদের নিকট, তখন তারা নির্দেশ অমান্য করতে থাকে, যখন তাহাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় এবং তখন তাহাদিগকে চুরমার করে নিপাত করে দিই।"

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান তখন তারা আরাম-আয়েস ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে, তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। এরূপ লোক আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ তার নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি মেনে চলার পরিবর্তে তার বিপরীত আচরণ করে সমাজে, দেশে বা তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন দেশসমূহে দূর্নীতি, অনাচার, জুলুম, অবিচার ছড়াতে থাকে। বিশিষ্ট তাফসিরকারক আল রাযী বলেন যে– "পবিত্র কোরআনে বিশেষ করে এরূপ লোকের কথাই বলা হয়েছে, কারণ তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করার বিনিময়ে তাদের উচিত ছিলো আল্লাহর নিকট অধিকতর শুকরিয়া আদায় করা।" অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী লোকের মানবীয় আচরণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যাহোক এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসীরের মতামত–

"আলোচ্য আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চান তখন দুষ্ট লোকদেরকে তাদের নেতা করে দেন।"

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা একটি বিষয় বারবার জোর দিয়ে বলতে চান যে, আল্লাহ ভীতি এবং ধর্মের নৈতিক নিয়ন্ত্রনের পাল্টা ব্যবস্থা না থাকলে পার্থিব বিষয় সম্পদের প্রাচুর্য অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্প্রদায় বিশেষের নৈতিক বোধ বিকৃত করে ফেলে। পবিত্র কোরআনের সূরা ২৮ কাসাস্ এর ৫৮ নং আয়াতের বাণী–

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ

"আর আমি এমন বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা স্বীয় জীবন-যাপনের সরঞ্জামের জন্য গর্বিত ছিল। অতএব এ সমস্ত তাদের বাসস্থান।"

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ
وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِيۤ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে- যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদের যে জীবনের উপকরণ দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যু আসার পূর্বে তার থেকে ব্যয় করবে। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু সময়ের অবকাশ দিলে আমি দান খয়রাত করতাম ও সৎকর্ম পরায়নদের অন্তর্ভূক্ত হতাম'।"

[সূরা ৬৩ মুনাফিকুন, আয়াত-৯-১০]

সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রনকে গুরুত্ব না দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি বা সমৃদ্ধি সমাজের যে ভয়াবহ বিপর্যয় ও সামাজিক ভারসাম্যের ব্যাপক অবনতি ঘটাতে পারে ইউরোপ ও আমেরিকা তার বাস্তব প্রমাণ। সাধারণত আমরা এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, তথাকথিত মানবাধিকার, গণতন্ত্র, উদারতাবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি গালভরা কথা শুনে এতই বিভ্রান্ত হই, তাছাড়া আমাদের দেশের নীতিহীন বুদ্ধিজীবীরা এদের এমন প্রশংসা করেন যে, তাদের বিবেচনায় 'দুনিয়ায় কোনো বেহেশত থাকলে তা যেন আমেরিকায়।' এখন আমরা আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থার না বলা কিছু তথ্য তুলে ধরব।

আমেরিকার প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী মাইকেল স্নাইডার (Michal Snyder) লিখেছেন, যৌন বিপ্লব (Sexual Revolution) আমেরিকার মহিলাদের কি কোনো উপকার করতে সক্ষম হয়েছে? না; বরং এর ফলে আমেরিকান মহিলারা ভয়াবহ দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। তাই বর্তমানে আমেরিকার পুরুষরা এই মর্মেই প্রশিক্ষিত হয়েছেন যে, তারা মহিলাদেরকে শুধুমাত্র যৌনতার প্রতীক ছাড়া তাদের আর কোনো ভুমিকা রয়েছে বলে মনে করেনা। তাই এটি একটি মাত্রাতিরিক্ত পুরুষ শাসিত সমাজে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, পৃথিবীর ১৩-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের গর্ভধারণে আমেরিকা পয়লা নম্বর। প্রতি বছর ১৯ মিলিয়ন লোক STD (Sexually Transmitted Disease) এ আক্রান্ত হয়। আমেরিকায় যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার অর্ধেক সন্তানই জন্মায় মহিলাদের ৩০ বছর বয়সের নীচে এবং তারা সবাই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ফসল। অন্য কথায় জারজ। আমেরিকার পারিবারিক জীবন সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। যদি কেহ বলে আমেরিকার মহিলারা যেন বিবাহের পবিত্র জীবন যাপন করে বা মডেলিং, ফ্যাশন বা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার হীন মনোবৃত্তি পরিহার করে যেন, অর্ধনগ্ন কাপড় চোপড় পড়া বাদ দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তির তিরস্কারের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। আমেরিকার সমাজ মেয়েদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, তারা স্বাধীন ভাবে শত শত লোকের শয্যাসংঙ্গী হতে পারবে। ২০১১ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১.৪ মিলিয়ন ব্যক্তি যৌনতা সংস্পর্শ রোগে আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে ৩৩% এর বয়স ২০ বৎসরের কম। ১৪-৪৯ বছরের প্রতি ৬ জন আমেরিকান নাগরিক যৌন রোগাক্রান্ত।

প্রতি বছর ২৪০০০ আমেরিকান মহিলা যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে মাতৃত্ব হারায়। হাইস্কুলে পড়ুয়া ৪৭% ছাত্রছাত্রী ব্যভিচারী। ১৩-১৯ বছর বয়সী প্রতি ৪ জন মেয়ে যৌন রোগাক্রান্ত। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে ১৩-১৯ বছর বয়সী প্রতি ৫ জন মেয়েই মা হতে চায়। টিন বয়সী মেয়েদের গর্ভের হার আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি যা কানাডার দ্বিগুনের চেয়েও বেশী। ফ্রান্সের চেয়ে ৩ গুন বেশী। জাপান থেকে ৭ গুন বেশী। পৃথিবীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের দিক থেকে আমেরিকা একটি চ্যাম্পিয়ান দেশ। প্রতি ৪টি শিশুর মধ্যে অন্তত একটি শিশু "একক মাতৃত্ব" (Single parent) পদ্ধতিতে প্রতি-পালিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নীল ছবি (x movie) তৈরীর দেশ হলো আমেরিকা। আমেরিকায় ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন শিশুকে হত্যা করা হয়। নিউইয়র্ক শহরের ৪১% গর্ভধারন নিষ্ফল

গর্ভে (Abortion) এ শেষ হয়। নিষ্ফল গর্ভের (Abortion) ৮৬% করানো হয় শুধুমাত্র সুবিধার জন্য।

আমেরিকার সংস্কৃতির বর্তমান রূপ-রেখা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আমেরিকান গবেষক Devvy Kid বলেন যে, "১৯৬০ সাল থেকে আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থায় এক জঘন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এবং তা ভদ্রোচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। কিন্ডার গার্ডেনে পড়ুয়া শিশুদেরকে যৌনতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। টেলিভিশন (ABC, CBS, NBC) অপারেটরগণ শুধু মৃদু যৌনতা শিক্ষার বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠানে পরিগনিত হয়েছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে শুধুই যৌনতার আবেদন ও শিক্ষা। ইতোপূর্বে এই জঘন্য যৌনতা শুধু পর্ন টিভি চ্যানেল HBO, Cinemax ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ABC, CBS, NBC ও অন্যান্য টিভি চ্যানেল গুলি প্রতিরাতে পাপ ও যৌনতা (Sex & Sin) উদগীরন করে।"

"ইতোমধ্যে আমরা এমন এক প্রজন্মকে সৃষ্টি করছি, যাতে যুবকরা কিভাবে পুরুষের মতো আচরণ করতে হয় তা জানেনা। আমাদের সংস্কৃতি তাকে এমন শিক্ষাই দেয় ফলে সে পিতা হতে অত্যন্ত দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এবং এর বদলে সে একজন "যৌনান্ধ মূর্খ" (Sex Obsessed Idiots) হয়ে উঠে সে কিনা শুধু কিভাবে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মহিলার শয্যাসংঙ্গী হতে পারে এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। আমরা সমাজে এই মূল্যবোধ লালন করলে কোনোক্রমেই এই ধরণের সামাজিক সমস্যার কোনো সমাধান করা সম্ভব হবে না।"

আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় দারিদ্রকে কি সম্পূর্নরূপে ধ্বংস করা গেছে যা এ ধরণের সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ যারা এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এই সব মূল্যবোধ লালন, প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। তাদেরই দাবি, না আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দারিদ্র দুরীকরণ করা সম্ভব হয় নাই; বরং আমেরিকায় এখনও প্রচুর লোক তাদের মান দারিদ্রসীমার বহু নীচে বসবাস এবং এদের সংখ্যাও প্রচুর বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে তত্ত্ব ও উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় যে এই সমাজব্যবস্থায় আমেরিকার জনগণ রীতিমতো দুনিয়ারূপী জাহান্নামে বসবাস করছে।

অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে সব সমস্যার প্রতি কোরআন দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে তাহলো, ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্নীতি, মুনাফাখোরী, গুদাম জাতকরণ ইত্যাদি। আল-কুরআন একে একটি বদ্ধমূল

আধ্যাত্মিক পীড়ার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছে এবং তা জাতির শৌর্য-বীর্যকে ধ্বংস করে দেয় মর্মে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন বলে–

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّيۤ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّيۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ
وَيَٰقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِى ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ
بَقِيَّةُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

"এবং মাদাইয়নের লোকদের নিকট তাদের একজন ভাই শুয়ায়েবকে পাঠিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন– ওহে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ! তোমরা আল্লাহকে মান্য ও ভয় কর এবং তাঁরই ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মান্যবর নাই, তোমরা পরিমাপ ও পরিমানে কম করিও না। অবশ্য আমি তোমাদেরকে সংগতি সম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষমান পরিবেষ্টনকারী আযাবের দিবসের ভয় করছি। এবং হে আমার জনগণ! তোমরা পরিমাপ ও পরিমান ঠিকভাবে দাও এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করো না এবং পৃথিবীতে কারো ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে কোনো দুষ্কর্ম করোনা। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর আমি তোমাদের কিছুর তত্ত্বাবধায়ক নই।"

[সূরা ১১ হুদ, আয়াত-৮৪-৮৬]

রাসূল (দ.) বলেছেন– "দুটি বিষয় তোমাদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে তাহলো, মাপ ও ওজন। এ দুটি বিষয়ের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত গুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।"[১]

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, এমন সব অসদাচরণ, যেমন- কোনো গ্রাহককে তার ন্যায় সংগত প্রাপ্য থেকে ওজনে কম দেওয়া বা যে জিনিস পরিমাপ করে বিক্রী হয় তাও চুক্তিবদ্ধ পরিমান থেকে কম দেয়া বা অন্য কোনো উপায়ে (গুদাম জাতকরন, মুনাফাখোরী, ও কালোবাজারী) মানুষকে তাদের ন্যায্য মালামাল ও অর্থ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এরূপ অসাধু পন্থা দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতারা সমতুল্য এবং তাই তা আল্লাহর প্রতি ঈমানের পরিপন্থী। অর্থাৎ

[১] সহিহ তিরমিজি, ব্যবসা-বানিজ্য পর্ব, ওজন ও পরিমাপ অধ্যায়, হাদিস নং-১২৬১; মিশকাত, ব্যবসা পর্ব, অগ্রিম বিক্রয় ও বন্ধক অধ্যায়, হাদিস নং-২৮৯০।

সব মানুষই যে আল্লাহর সৃষ্ট এবং সবার উৎস এক এরূপ বিশ্বাসের পরিপন্থী। অতএব, যদি কেউ মানুষের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে এবং সব মানুষই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হয়। তাই এই কারণে তার দেশবাসীর থেকে অনৈতিক সুবিধা আদায় করা কারও উচিত হবে না। যে এরূপ অপরাধে অপরাধী, যে তার নিজস্ব উচ্চতর সত্তা অর্থাৎ তার মধ্যে সে স্বর্গীয় সত্তার উপাদান রয়েছে তার নির্দেশকেই অমান্য করে। অধিকন্তু ব্যবসা বা শিল্প যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, একবার যদি কোনো দল বা গোষ্ঠী এরূপ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়, তখন তাদের এসব অভ্যাস যে মনোভাবের সৃষ্টি করবে তা কেবল উক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; আগে হোক বা পরে হোক, তার ধারা অতিমাত্রায় প্রবাহিত হয়ে সামাজিক ও নৈতিক আচরণের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করবে। নৈতিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় বলে যে ধারণা করা হয় তা আদতে ভুল। নৈতিকতার যে বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে তাদের একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে একে অপরের উপর ক্রিয়া সাধন করে এবং একটি পূর্ণ সূত্র সৃষ্টি করে, উহার প্রতিটি অংশ অপরাপর অংশ দ্বারা সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। অতএব আল-কুরআন ব্যবসায়িক দুর্নীতিকে একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ (Cognizable Offence) হিসাবে চিহ্নিত করে এবং শাস্তিযোগ্য (Punishable) অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। অন্যায় ভাবে নরহত্যাও আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ সম্পর্কে কোরআন ঘোষণা করেন যে–

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

أُولَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

"যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে ও যে সব লোক ন্যায় সঙ্গত আদেশ দেয় তাদেরও হত্যা করে। তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। এই সব লোকের ইহকাল ও পরকালের কাজকর্ম ব্যর্থ হবে ও কেউ তাদের সাহায্য করবেনা।"

[সূরা ০৩ আল ইমরান, আয়াত-২১-২২]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা উল্টো দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এই তাদের লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" [সূরা ০৫ মায়িদা, আয়াত-৩৩]

وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"আর অবিশ্বাসীগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কাল বিলম্বিত করি। আমি কাল বিলম্ব করি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।"

[সূরা ০৩ আল ইমরান, আয়াত-১৭৮]

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ
أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ

"যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ তাদের মাটির নীচে বিলীন করবেন না? বা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারনাতীত। বা চলাফেরার সময়ে তিনি ওদের পাকড়াও করবেন? ওরা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না।" [সূরা ১৬ নাহল: ৪৫-৪৬]

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন যে–

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

"স্মরণ কর, সেদিনের কথা যখন আমি সকল মানুষকে তাদের ইমামসহ আহ্বান করব"। [সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াত-৭১]

এ কারণে প্রত্যেক লোক সে যার নেতৃত্ব মেনে চলে তা তার জীবন চলার পথে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ তার সমগ্র জীবন যাপন ও কর্মপন্থা সেই নেতার মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে তা হলে সে ইহকালে ও পরকালে উপকৃত হতে পারে। অন্যথায় সে মহাক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই বিষয়টি বিবেচনা রেখে মহানবী (দ.) বলেছেন– "যে ব্যক্তি নিজের যুগের

ইমামের মারফত (সঠিক পরিচয়) ছাড়াই মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।"[২]

মানুষের কর্মই তার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের কারণ তাই তার জীবন চলার পথে এমন এক সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ কর্মসূচীর প্রয়োজন বোধ করে, যে কর্মসূচী তার দুনিয়া ও আখেরাতের এবং দেহ-মনের স্বার্থ ও মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। তার পার্থিব জীবনের কর্মসূচি এরূপ হবে; যা একদিকে তার পারলৌকিক জীবনের ও রুহের ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হবে না। আর অপর দিকে তার রুহ বা নফসের কর্মসূচিকে নির্ধারণ করবে, যা তাকে নিরাপদ বাসস্থানে পৌঁছে দেবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সহায়ক হবে।

- মানুষ কি নিজ থেকেই তার প্রকৃত সৌভাগ্য লাভের জন্য এরূপ একটি পরিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম কর্মসূচি সম্বলিত ঐশী সংবিধান নিজ বুদ্ধি ও চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে নির্ধারণ করতে সক্ষম?
- সে কি তার আত্মিক ও পরকালের চাহিদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত?
- মানুষ কি তার দেহ ও আত্মা সম্পর্কে অবহিত? সে কি নির্ভুল ভাবে জানে যে, কোন বিষয় ও কোন কাজটি তার ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হতে পারে?
- কোন সব কাজ মানুষের অন্তরকে নিষ্প্রভ ও কলুষময় করে তোলে?
- মানুষ কি একাকী তার "সিরাতে মুস্তাকিম" ও সৌভাগ্যের পথটিকে অসংখ্য ভ্রান্ত পথ থেকে বেছে নিতে পারে?

এ সকল প্রশ্নের একটি মাত্র সঠিক উত্তর তাহলো– "না"। সে তা পারে না। মানুষ তার স্বল্প আয়ু ও সংকীর্ণ চিন্তাবুদ্ধির দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে না। তাহলে কে পারে? হাঁ, একমাত্র মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কারো সে ক্ষমতা নাই। কেননা তিনিই হচ্ছেন মানুষ ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা। তাই একমাত্র তিনিই এ সৃষ্টি জগত ও মানুষের সব রহস্য ও জটিলতার পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের সৌভাগ্য লাভের উপায় ও পন্থা সম্বলিত কর্মসূচি নির্ধারণ করে থাকেন। অতঃপর তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নবী-রাসূল, খলীফা, ইমাম, উলিল আমর, হাদী, মুর্শিদের দ্বারা এই কর্মসুচি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। যাতে সে আল্লাহর কাছে কোনো রকম অজুহাত দেখাবার সুযোগ না পায়। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়োগ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানের কয়েকটি আয়াত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমেই সূরা ০২ বাকারা'র ১২৪ নং আয়াত–

---

[২] মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃ-১২৮; মুসনদে হাম্বল, খণ্ড-৪, পৃ-৯৬।

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ

"আর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি নিদর্শন দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। তখন তিনি তাতে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ন হলেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে বললেন– 'আমি তোমাকে পৃথিবীর লোকদের ইমাম (নেতা/আমীর/মান্যবর/শাসক) নিযুক্ত করে দিচ্ছি।' ইবরাহীম বললেন– 'আমার বংশদরদের মধ্য হতেও।' আল্লাহ বলেন– 'অত্যাচারীদের ক্ষেত্রে আমার এই বিধান (অর্থাৎ ইমাম নিয়োগের বিধান) প্রযোজ্য হবে না'।"

يَٰدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

"হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি/শাসক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত) নিয়োগ করেছি সুতরাং মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে।" [সূরা ৩৮ সা'দ, আয়াত-২৬]

ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا

"আল্লাহ যাকে পথনির্দেশ দান করেন সে পথপ্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন তার জন্য তুমি পথ নির্দেশক (ওলীয়াম মুর্শেদা) পাবে না।"

[সূরা ১৮ কাহ্‌ফ, আয়াত-১৭]

অর্থাৎ পৃথিবীর জন্য মানবজাতির নেতা/প্রশাসক/পথনির্দেশক/মান্যবর এমন ব্যক্তিই হবেন যিনি আল্লাহ কর্তৃকই নিয়োজিত হবেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো–

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ প্রতিশ্রুতি (তাঁর) প্রতিনিধি (প্রশাসক/মানবজাতির ইমাম/নেতা, আল্লাহ প্রদত্ত প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী)। নিযুক্ত করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের তিনি অনুরূপ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন।"

[সূরা ২৪ নূর, আয়াত-৫৫]

আল্লাহর প্রতিনিধি নিযুক্তির বিষয়টি কোনো অভিনব বিষয় নয় তা জানানোর জন্য আল্লাহতালা বিষয়টি পূর্নব্যক্ত করে বলেন–

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِن بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ
إِنَّ فِى هَـٰذَا لَبَلَـٰغًا لِّقَوْمٍ عَـٰبِدِينَ

"নিঃসন্দেহে স্মারক বাণী (তাওরাতের) পর যাবুরে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম যে, পৃথিবীর অধিকারী (মালিক/নেতা/প্রশাসক নেতৃত্বের অধিকারী আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্ব পরিচালনার জ্ঞান ও শক্তি/ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি) আমার সৎ বান্দারা। নিশ্চয়ই এতে উপাসনাকারী সম্প্রদায়ের জন্য বার্তা রয়েছে।" [সূরা ২১ আম্বিয়া, আয়াত-১০৫-১০৬]

বর্ণিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, এই নিয়োগ পদ্ধতি হলো আল্লাহর একটি অপরিবর্তনীয় স্থায়ী বিধান।

আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তথা নেতাকে না মানা বা অনুসরণ না করা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে–

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠
وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠
رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

"যেদিন আগুনের মধ্যে তাদের মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দেওয়া হবে সেদিন তারা বলবে হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম! এবং তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও মুরুব্বীদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুন শাস্তি দাও এবং তাদের মহা অভিসম্পাত দাও"। [সূরা ৩৩ আহযাব, আয়াত-৬৬-৬৮]

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নেতৃত্ব সম্পর্কে আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে অধিকাংশ মুসলিম আইন ও কালাম শাস্ত্র বিজ্ঞানী এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা নেতৃত্ব কোনো পাপাচারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উপর ন্যাস্ত করা বৈধ নয়।

মানবজাতির প্রতি আল্লাহতালার সাধারণ উপদেশ (General instruction) দিয়েছেন, তাহলো–

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ وَإِيتَآىِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন, আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

[সূরা ১৬ নাহল, আয়াত-৯০]

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ পর্যলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ পৃথিবীর বিপর্যয় ও পৃথিবীবাসীর বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশা সবই আল্লাহতালার অবাধ্যতার পরিণতি। যদি আল্লাহর বান্দারা নিজেদের পালনকর্তার আনুগত্যে আদেশ-নিষেধ যথাযথভবে প্রতিপালন করে তাহলে সামাজিক সমস্যা দেখাই দেবে না। আর সাময়িকভাবে যদি দেখা দেয় তাও আল্লাহর রহমতে অচিরেই তা দূর হয়ে যায়।

সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ

অর্থাৎ আল্লাহ কোনো ধরণের নির্দেশ প্রতিপালন না করলে কোনো ধরণের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় সে ব্যাপারে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

> হযরত আবুদারদা (রা.) বলেন– "আমার বন্ধু রাসূলাল্লাহ (দ.) আমাকে নসীহত করেছেন যে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করোনা, তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও এবং তোমাকে জ্বালিয়ে ফেলা সত্ত্বেও আর ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ পরিহার করো না। কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরয নামায ছেড়ে দিলে তার উপর থেকে আল্লাহ তালার দায়িত্ব উঠে যায়। তাছাড়া মদ্য পান করোনা। কারণ এ হলো যাবতীয় অপকর্মের চাবিকাঠি।"[৩]

আল্লাহ তালার দায়িত্ব উঠে যাওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর যে নিরাপত্তা বেষ্টনী মানুষকে সুরক্ষা করার জন্য বিরাজমান রয়েছে, তা আল্লাহ তুলে নেন, ফলে সেই লোক পার্থিব জগতে যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ তার অভিভাকত্ব থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত হয়ে যান। তাই দুনিয়াতে কার্যত ঐ ব্যক্তি শয়তানের অনুসারী হয়ে যায় এবং শয়তান তার অভিভাবক হয়ে যায়।

> হযরত আবু দারদা থেকে বর্ণিত, রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহতালা বলেন– "আমি সমস্ত সৃষ্টির উপাস্য। আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। আমি রাজন্যবর্গের অধিপতি। সম্রাটদের সম্রাট। রাজাদের অন্তর আমার নিয়ন্ত্রনাধীন। বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে, তখন তাদের রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে রহমত ও করুণার সমন্বয়ে তাদের দিকে ঘুরিয়ে দেই। আর যখন বান্দারা আমার অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তখন রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে রাগ ও কঠোরতার দিকে ঝুকিয়ে দেই, যার ফলে তারা প্রজাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করায়। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা রাজা-বাদশাহদের জন্য বদ দোয়া করোনা; বরং আমার স্মরণে আত্মনিয়োগ কর এবং আমার সামনে কান্নাকাটি করতে থাক আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবো। (অর্থাৎ আমি তোমাদের সাহায্য করব। রাজা-বাদশাহ তথা শাসন কর্তাদের অন্তরে করুণা বিস্তার করব)।"[৪]

---

[৩] মিশকাত শরীফ, ঈমান পর্ব, কবিরা গুনাহ ও মোনাফিকদের চিহ্ন অধ্যায়, হাদিস নং-৬১; মুসনাদে ইমাম আহমেদ, খণ্ড-০৫, পৃষ্ঠা-২৩৮।

[৪] আবু নোআইম এর হিলইয়া গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

> অন্য একটি হাদীসে আছে– "তোমরা যেমন হবে, তোমাদের উপর বাদশাহ তথা শাসনকর্তাও তেমনি চাপিয়ে দেওয়া হবে।"[৫]

অর্থাৎ তোমরা যদি সৎ ও সৎকর্মী ও খোদাভীরু হও তাহলে তোমাদের জন্য সৎ ও দয়ালু বাদশাহ নিয়োগ করবেন। আর তোমরা অসৎ ও অবাধ্য হও, তাহলে তোমাদের উপর বাদশাহ বা শাসন কর্তাও অসৎ, ফাসেক, ফাজের ও জালেম নিয়োগ করা হবে।

এই হাদীস দুটি থেকে বোঝা যায় যে, জালেম ও অত্যাচারী শাসনকর্তা চাপানো হয় মানুষের অপকর্মের শাস্তি হিসাবে। শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রজা তথা সাধারণ নাগরিকদের যে সব অন্যায়-অত্যাচার করে তার প্রতিফল অবশ্যই তারা দুনিয়া ও আখেরাতে পাবে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য তাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন জনগণের অপকর্মের শাস্তিরূপেই আরোপিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর শাসকরা জনগণের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে থাকে, শাসনকর্তাদের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য নানারকম উপায়-পন্থা উদ্ভাবন করে। নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কখনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নির্বাচনে অমুক দলকে ক্ষমতায় আনতে পারলে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। আবার কখনো অন্য কোনো পন্থায় বিপ্লব ঘটিয়ে নতুন লোক কিংবা নতুন দলের হাতে ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব অর্পন করে শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা হয়। কিন্তু যাই করা হোক না কেন, পরিণতিতে সমস্ত চেষ্টা পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মূল কারণ তাই যা হাদীসে বলা হয়েছে।

> রাসূল (দ.) বলেছেন– "যে জাতির মাঝে ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে তাদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয় আর যাদের মাঝে উৎকোচ (ঘুষের) বিস্তার লাভ করে, তাদেরকে পাকড়াও করা হয় ভীত ও আতংকের মাধ্যমে।"[৬]

এই হাদীসে দুটি অপকর্মের অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যভিচারের ব্যাপকতা দুর্ভিক্ষ তথা আকাল পড়ার কারন। দ্বিতীয়তঃ ঘুষের লেনদেন মনে আতঙ্ক সৃষ্টির কারন। যদি বর্তমান সমাজের লোকদের ব্যাপারে হালকা ভাবেও জরীপ করা যায় তাহলে জানা যাবে ব্যভিচার ও ঘুষের বাজার অত্যন্ত জমজমাট। তাই এ দুটির পরিণতিতে আকাল পড়া এবং মনে ভয় ও

---

[৫] মেশকাত শরীফ।

[৬] মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বাল।

আতঙ্ক চেপে বসার ব্যাপারটিও গোপন নয়। সবারই তা চোখের সামনে স্পষ্ট। পতিতালয়ে যে ব্যভিচার হয় তা তো সবারই জানা। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পকলা সংস্থার কর্মকাণ্ড তথা বিজ্ঞাপন, সিনেমা, নাটক, টেলিভিশনে নর-নারীর অবাধ কর্মক্ষেত্রে ফ্যাশন, মডেলিং এর নামে যে সব ব্যভিচার হয় সে সম্পর্কে যারা জানার তারা ঠিকই জানে। সুতরাং প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বব্যাপী কি পরিমান নারী-পুরুষ কতবার ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে তা অনুমান করে যে কোনো লোকই এই ভয়াবহ গুনাহ সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কেন ধ্বংস করে দিচ্ছেন না এটিই তার অপার করুণা এ কথা ভাবতে বাধ্য হবেন। তাই তিনি এলাকা ভিত্তিক দুর্ভিক্ষ বা অনুরূপ শাস্তি দিয়ে থাকেন।

বর্তমানে পৃথিবীতে যৌন আবেদন ও ব্যভিচার শিল্পকলায় পরিণত হয়ে গেছে, ফ্যাশন, ষ্টাইল, করর্পোরেট লিভটুগেদার, কালচার, আধুনিকতা, স্মার্টনেস ইত্যাদির অংশে রূপান্তরিত হয়ে সাধারণ রেওয়াজ/কালচার হিসাবে ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে। এ ছাড়া উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করলে তা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তি যোগ্য অপরাধ (Cognizable Offence) হিসাবে গণ্য না হওয়ায় এর ব্যাপকতা উপুর্যপরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষ কেমন করে আল্লাহতালার কাছে তার রহমত তথা দয়া ও করুণার দাবি করতে পারে?

অনুরূপভাবে ঘুষের ব্যাপারটিও লক্ষনীয়। জনজীবনের এমন কোনো কাজ আছে যেগুলো বিনা ঘুষে সম্পন্ন হতে পারছে? সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উপঢৌকন না দিয়ে কোনো কাজই হয় না। ইদানীং সিগারেট, নিমন্ত্রণ, বিদেশ ভ্রমণ, পার্টি, ঘুষ হিসাবে চালু করা হয়েছে। হাদীসে রয়েছে–

> "রাসূল (দ.) ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহিতা এবং ঘুষদানে সাহায্যকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।"[৭]
>
> অন্য এক হাদীসে রাসূল (দ.)-এরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি কারও জন্য কোনো সুপারিশ করে এবং ঐ ব্যক্তি সুপারিশকারীকে কোনো উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণও করে নেয়, তাহলে সে সুদের দরজা গুলোর মধ্য থেকে একটি বড় দরজায় চলে গেল।"[৮]

---

[৭] মেশকাত শরীফ, বিচার বিভাগীয় পর্ব, শাষকের জিবীকা ও উপঢৌকন অধ্যায়, হাদিস নং-৩৭৫৩; সহিহ তিরমিজি, হাদিস নং-১৩৩৭; আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং-৩৫৮০; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২৩১৩।

[৮] মেশকাত শরীফ, বিচার বিভাগীয় পর্ব, শাষকের জিবীকা ও উপঢৌকন অধ্যায়, হাদিস নং-৩৭৫৭; আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং-২৪৯৫।

অর্থাৎ সুপারিশ করার বদলে কোনো উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা হলে, তা সুদ গ্রহণেরই সমান। এ হাদীসের দ্বারা এ কথাও প্রমাণ হলো যে, নামের পরিবর্তন করে নিলেই আসল বস্তু বদলে যায়না বা গুনাহর কোনো হেরফের হয়না। ঘুষের নাম 'উপহার' রাখলেও তা ঘুষই থেকে যায়, মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে–

> "রাসূল (দ.) ইবনে লুৎবিয়াহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠান। যাকাত আদায় করে এসে লোকটি নিবেদন করল। এগুলো বাইতুল মালের অংশ আর এ মালগুলো আমাকে উপহার হিসাবে দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (দ.) বলেন– আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো কোনো লোককে যে সব কাজের জন্য নিযুক্ত করি সে গুলোর ব্যাপারে আল্লাহতালা আমাকে মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) বানিয়েছেন। কিন্তু তাদের একজন এসে বলে– এগুলো তোমাদের আর এগুলো আমাকে উপহার হিসাবে দেয়া হয়েছে। লোকটি নিজের পিতা বা মাতার ঘরে গিয়ে বসে থাকল না কেন? তাহলেই দেখতে পেতো তাকে উপহার দেওয়া হয় কিনা?"[৯]

এই হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, পদমর্যাদার কারণে যে সব উপহার সামগ্রী পাওয়া যায় তা আসলে ঘুষ।

হারাম বস্তুর নাম পাল্টে কিংবা তার অন্য কোনো আকার গঠন করে হালাল বানিয়ে নেয়ার প্রচলন পূর্বেও ছিল। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত এক রেওয়াতে রাসূল (দ.)-এরশাদ করেছেন যে–

> "ইহুদীদের জন্য আল্লাহতালা যখন চর্বির ব্যবহার হারাম করে দেন, তখন ওরা সেটিকে সুন্দররূপে (অর্থাৎ তেলে) রুপান্তরিত করে বিক্রি করল ও মূল্য ভোগ করল।"[১০]

> হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন– একদিন রাসূল (দ.) আমাদের লক্ষ্য করে বলেন, "হে মুহাজেরগণ! আল্লাহ না করুন পাঁচটি বিষয়ে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়বে (তাহলে এই পাঁচটি বিষয়ের পরিণতিতে অবশ্যই পাঁচটি বিষয় প্রকাশ পাবে)। তারপর তিনি সেগুলো বিস্তারিত বললেন–

> ১। যখন কোনো জাতি-সম্প্রদায়ের মাঝে খোলাখুলী অশ্লীল কাজ হতে শুরু করে, তখন অবশ্যই তাদের মাঝে প্লেগ (ইউরোপে এটি একাদশ শতাব্দীতে

---

[৯] মেশকাত শরীফ, ব্যবসা পর্ব, হালাল রুজির তালাশ অধ্যায়, হাদিস নং-২৭৬৭; বুখারী শরীফ, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে অধ্যায়, হাদিস নং-৩৪৬০; মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-১৫৮১।

[১০] মেশকাত শরীফ।

ব্যাপক হারে দেখা যায় বর্তমানে এইডস ও সমজাতীয় অসুখ) এবং এমন সব রোগ-ব্যধি ছড়িয়ে পড়বে, যা তাদের বাপ দাদাদের মধ্যে কারও হয়নি

২। আর যে সম্প্রদায় মাপে ও ওজনে কম দিতে শুরু করবে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, কঠোর পরিশ্রম ও শাসনকর্তার অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা পাকড়াও করা হবে।

৩। আর যারা নিজের সম্পদের যাকাত বন্ধ করে দেবে তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে রাখা হবে। এমনকি গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গবাদি পশু না থাকলে আদৌ বৃষ্টিপাত হবেনা।

৪। আর যে জাতি আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে (কোরআনে প্রদত্ত আল্লাহর ও রাসূলের নির্দেশের আলোকে জীবন দর্শন অনুসরণ না করা) আল্লাহ তাদের উপর অন্য জাতির মধ্য থেকে শত্রু চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের অধিকারভুক্ত বস্তু-সামগ্রী দখল করে নেবে।

৫। আর যে জাতির ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা আল্লাহ তালার কিতাবের বিপরীত ফায়সালা দেবে এবং তাঁর হুকুম-আহকামে নিজেদের অধিকার ও পছন্দ-অপছন্দ প্রবর্তন করবে তখন এরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে।"[১১]

এ পর্যায়ে আমরা বর্ণিত হাদীসটির ৪ ও ৫ নম্বর বিষয়টি আলোচনা করব–

"যে জাতি আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে আল্লাহ তাদের উপর অন্য জাতির মধ্য থেকে শত্রু চাপিয়ে দেবেন যারা তাদের অধিকারভুক্ত বস্তু সামগ্রী দখল করে নেবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতাও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বিচার না করে মুসলমানদের রাজনৈতিক পরাধীনতার ও অর্থনৈতিক দুর্দশার অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে আমরা কি ওয়াদা করেছি তা কি আমরা অর্থাৎ বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ কি তা মনে রেখে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মেনে চলেছি। কালেমা গ্রহণে তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কালেমা স্বীকার করার মাধ্যমে আমরা এই মর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা আল্লাহকে পালনকর্তা, অন্নদাতা, অভাব মোচনকারী, সকল প্রকার পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য বিধি-বিধানদাতা, দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক এবং নিজেদের উপাস্য মান্য করব বলে ওয়াদা করেছিলাম। আর তাঁর হাবীব

[১১] ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৪১৪৫।

ফখরে আলম হযরত মুহাম্মদ (দ.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলব বলে অঙ্গীকার করেছিলাম। এই ওয়াদা অঙ্গীকারের দাবি অনুযায়ী আমরা যতদিন চলেছি ততদিন সমগ্র বিশ্বের উপর মুসলিম জাতি প্রবল শক্তি ও সম্মানের অধিকারী জাতি হিসাবে পরিগণিত হতো। কিন্তু এই চুক্তি ও ওয়াদা প্রতিপালন না করার জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মুসলিম জন-সম্বলিত দেশ বিধর্মী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য সহ আফ্রিকা পর্যন্ত এমন কোনো দেশ ছিলনা যা ব্রিটিশ, ফ্রান্স, জার্মান, স্পেন, ইতালী ওলন্দাজদের পদানত হয় নাই। মুসলমানরা বিধর্মীর দাসে পরিণত হয়েছে তাদের সহায়-সম্পত্তি, মান-সম্মান, ধর্ম সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাপটে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই ধারা অব্যহত আছে। অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠি পবিত্র কোরআন বা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনার মধ্যে তাদের প্রকৃত মুক্তি রয়েছে তার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন না করে তারা তথাকথিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা, পূঁজিবাদ প্রভৃতি বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ মুসলমানদের মগজ ধোলাই করে এক মহা বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করেছে।

> মহানবী (দ.) এরশাদ করেছেন– "যারা কোরআনের পরিপন্থী হুকুম (অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান) জারী করবে তারা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হবে।"

এ বক্তব্যের বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। বর্তমানে আপাত দৃষ্টিতে বিদেশী শাসক মুসলিম দেশে না থাকলেও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ কোথাও কোরআন ও হাদীসের মর্মানুযায়ী শাসনতন্ত্র ও বিধি-বিধান তৈরী করেনি; বরং অধিকাংশ দেশে সুদ ভিত্তিক পূঁজিবাদ চালুর মাধ্যমে কোরআনে বর্ণিত যাকাত ভিত্তিক ও ধনীদের মধ্যে সম্পদ কেন্দ্রিভুত না হওয়ার নীতি ত্যাগ করেছে। আল্লাহকে রিজিকদাতা না ভেবে নিজেরাই 'রাজ্জাক' দাবি করে আসছে। তাই আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন–

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً

"তোমরা দারিদ্রের ভয়ে নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি রিযিক (জীবিকা) দান করে থাকি। নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা মহাপাপ।" [সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াত-৬১]

অথচ খোদা বিস্মৃত মানুষ নিজেদেরকে মনে করে রিযিকের জিম্মাদার। আরবের মুর্খরা সন্তান জন্মের পর খাওয়াবার ভয়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলত। আর বর্তমানের শিক্ষিত মূর্খরা সন্তান জন্ম হওয়ার আগেই তার

আগমনের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে আবার জন্মের পরেও তাকে হত্যা করার লাইসেন্স দিয়ে থাকে এবং এই ওসীলায় সমাজের সার্বিক অশ্লীলতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

আধুনিক মুসলিম দেশসমূহে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করা ও তাঁর বিধানের অনুবর্তিতাকেও ইসলামের ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থার চলাকে সেকেলেপনা ও মধ্যযুগীয় বা অন্ধকার যুগের চিন্তাধারা হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে। বর্তমানে তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বহু দলীয় বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারা সমাজে কোনো একক মতাদর্শ স্থাপনে বড় বাধা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়ায় শাসন কর্তৃপক্ষ ও বিরোধীদলের টানাপোড়নে কোনো দীর্ঘ মেয়াদী রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ বা নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রে যে গৃহযুদ্ধ হয়ে থাকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এই হাদীসে অন্য এক শ্রেণির ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে তারা হলেন আধুনিক যুগের প্রগতিশীল মুজতাহেদীন তথা মুসলিম বুদ্ধিজীবী বা আলেম সমাজ যারা আল্লাহর কিতাবের খেলাফ সিদ্ধান্ত দেবেন এবং আল্লাহর আইনে নিজেদের অধিকার চালাবেন। এরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মকে পরিবর্তন করার মিশনে নিয়োজিত রয়েছে। যারা আল্লাহর নবী-রাসূল, উলিল আমর ও আল্লাহর ওলী, মুর্শীদ মান্য করা 'শিরক' বা তাঁদের কাছে ধর্ম শিক্ষা করা বা তাঁদের মাযার যিয়ারত 'বিদআত' ইত্যাদি বলে এই সব আল্লাহ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের থেকে সাধারণ মুসলমানদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন। আবার এদের এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা কোরবানীকে নিষ্ঠুরতা ও অর্থের অপচয় হিসাবে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। পুঁজিবাদের দালাল কোনো কোনো মাওলানা বলে থাকেন যে, কোরআনে বর্ণিত সুদের সঙ্গে বর্তমান সময়ের আধুনিক সুদের কোনো মিল নাই তাই এটি জায়েজ। এই ধরণের আলেম/বুদ্ধিজীবীগণ ইসলামকে একটি পাদ্রীপণ্ডিতদের ধর্মে পরিণত করতে চায় ওরা যেমন নিজেদের ধর্মে কাটছাট করে- তেমনি এরাও ইসলামকে আল্লাহ রাসূল (দ.)-এর ধর্মকে বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব ধর্ম বানাতে চায় (নাউজুবিল্লাহ)।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায় সঙ্গত কর্মের আদেশ করবে ও অসঙ্গত কর্মে বাঁধা প্রদান করবে, আর এরাই সফলকাম হবে।" [সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-১০৪]

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরা সর্বোত্তম দল, যাকে মানব জাতির (পথ প্রদর্শনের) জন্য উদ্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায়কর্মের আদেশ দাও ও অসঙ্গত ও অপছন্দনীয় কর্মে বাধা প্রদান কর। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ কর।"

[সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-১১০]

হযরত হোযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন– "সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্য অবশ্যই তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দিতে থাক এবং অসৎ কর্ম থেকে বারণ করতে থাক। অন্যথায় আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর নিজের পক্ষ থেকে আযাব পাঠিয়ে দেবেন। তখন আল্লাহর কাছে তোমরা দোয়া প্রার্থনা করবে, অথচ তা কবুল করা হবে না।"[১২]

সূরা ০৩ আল ইমরান এর ১০৪ ও ১১০ নম্বর আয়াতের মর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই উম্মতের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আমর বিল মারুফ (তথা সৎকর্মের নির্দেশ দান) ও নাহী আনিল মুনকার (অর্থাৎ অসৎ কর্মে বারণ করা)। এ বিষয়টি ফেকাহর দৃষ্টিতে কখনও ফরজে আইন, কখনও ফরজে কেফায়া, কখনও ওয়াজেব, কখনও মুস্তাহাব কিন্তু যে কোনো অবস্থায় 'আমর বিন মারুফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' এ উম্মতের বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এই বিষয়টি পুনঃব্যক্ত করে পবিত্র কোরআনের সূরা ০৯ তাওবার ৭১ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলারা পারস্পরিকভাবে একে অপরের সুহৃদ ও অভিভাবক। তারা পরস্পরকে সৎকর্মের উপদেশ প্রদান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। নামাজ কায়েম করে। যাকাত

[১২] মিশকাত শরীফ, হাদিস নং-৫১৪০; সহিহ তিরমিজি, হাদিস নং-২১৬৯; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১৩২৭; মুসনাদ– ইমাম আহমেদ, খণ্ড-৫, হাদিস নং-৩৮৮।

আদায় করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। তারা ঐসব লোক যাদের উপর আল্লাহ সহসা দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

মানুষ দুনিয়া প্রীতির কারণে আল্লাহতালার আনুগত্য ভুলে যায় এবং আখেরাতের নেয়ামত তথা আশীর্বাদের উপর তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে দুনিয়ার নেয়ামত তথা স্বাদ-আহ্লাদ, প্রাচুর্য, মোহকেই মূখ্য মনে করে পাপকাজে লিপ্ত হয়। মানুষের এসব দুর্বলতাও শৈথিল্যের কারণে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দিতে এবং আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করতে স্মরণ প্রচারে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে। যখন এ ধারা অব্যহত থাকে, তখন এই উম্মতের সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণিতে ধর্মীয় বিধিমালা অনুযায়ী চলার রেওয়াজ ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে আল্লাহপাকের রহমত ও সাহায্য তাদের সঙ্গে থাকে। পক্ষান্তরে 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহী আনিল মুনকারের' দায়িত্ব যদি যথাযথভাবে পালিত না হয়, তাহলে দুটি কারণে আযাব এসে উপস্থিত হয়। প্রথমত: এ কারণে যে, এই নির্দেশ হলো অবশ্য পালনীয় যা বর্জন করা হলে উম্মাহর ধ্বংস ও বিনাশ অনিবার্য। দ্বিতীয়ত: এ ফরজ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে মানুষের মাঝে আল্লাহতালার প্রতি আনুগত্যের মন মানসিকতা বিনষ্ট হয় এবং সমাজে পাপ প্রবল হয়ে পড়ে। ফলে গোনাহর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে লোকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে।

উল্লেখ্য, এই নির্দেশ প্রতিপালনের জন্যই হযরত ইমাম হোসাইন কারবালার ময়দানে পরিবার সহ শহীদ হয়েছেন। তাই এর সম্যক গুরুত্ব সহজেই বোধগম্য। তাই 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' পালনের মুসলিম সমাজের শৈথিল্যের কারণে সমাজ জীবনে যে ভয়াবহ আযাব নেমে আসবে, তখন যে দোয়া প্রার্থনা করা হবে, তাও বিফল হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (দ.)-এর এ হাদীসটি[১৩] স্মরণ করা যেতে পারে–

> রাসূল (দ.) বলেছেন- "আল্লাহতালা জালেম (অত্যাচারী) দের অবকাশ দিতে থাকেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না।" এরপর রাসূল (দ.) নিজে বক্তব্যের সমর্থন কোরআনের সূরা **১১** হুদের **১০২** নম্বর আয়াত পাঠ করেন–
>
> وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

[১৩] সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফ।

"তোমার পালনকর্তার পাকড়াও এমনই (কঠিন যে) যখন তিনি অত্যাচারে লিপ্ত জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন, তখন অবশ্যই তার পাকড়াও অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কঠোর।"

ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ পরিহারের নির্দেশ প্রদান না করায় একজন আবেদের শাস্তি প্রসঙ্গে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য–

> "রাসূল (দ.)-এরশাদ করেছেন (একবার) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরাইল (আ.)-কে হুকুম করলেন– 'অমুক নগরীর অধিবাসীও তা উল্টে দাও (ধ্বংসকর) অর্থাৎ ভূমির উপরের অংশকে নীচের এবং নীচের অংশকে উপরে করে দাও যাতে সেখানকার লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' জিবরাইল (আ.) নিবেদন করলেন– 'হে আমার পালনকর্তা! সে সব লোকের মাঝে অমুক লোকটি তোমার এমন বান্দা, যে নিমেষের জন্যও তোমার নফরমানী করেনি। তাই তাঁকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখা হোক।' আল্লাহ পাক বল্লেন– 'তাকে সহ নগরীটিকে উল্টে দাও। কারণ আমার ব্যাপারে তার চেহারা কখনও মলিন হয়নি'।"[১৪]

অর্থাৎ সে নিজে অত্যন্ত সৎ বটে, কিন্তু সে বারবার মানুষকে পাপকাজ করতে দেখেছে তথাপি মুখে বাধা দেওয়া তো দুরের কথা, সে এগুলো দেখে কখনও ঘৃণা প্রকাশ পর্যন্ত করেনি।

এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নিজে সৎ ও অনুগত হয়ে বসে থাকা ধার্মিক বা দ্বীনদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং মানব মণ্ডলীকেও আল্লাহর নির্দেশের উপর পরিচালনার জন্য তথা সমাজ সংস্কারের ব্যাপরে চিন্তাভাবনা করাও ঈমানের অপরিহার্য একটি দাবি।

মেশকাত শরীফে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্‌র উদ্ধৃতিতে হযরত জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে–

> "মহানবী (দ.)-এরশাদ করেছেন যাদের ভিতরে এমন কোনো লোক যাকে যে পাপে লিপ্ত অথচ তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার অবস্থার পরিবর্তন না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাদের উপর আযাব পাঠিয়ে দেন।"

এ বিষয়টি মহানবী (দ.) একটি উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বুঝিয়েছেন যে–

> "আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমায় যে লোক শৈথিল্য প্রদর্শন করে (অর্থাৎ পাপী-তাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং পার্থিব স্বার্থের জন্য পাপ কর্ম

[১৪] বায়হাকী শরীফ।

দেখেও চুপটি মেরে থাকে এবং কখনও তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে না) তার এবং আল্লাহ কর্তৃক সীমালংঘনকারীদের দৃষ্টান্ত এমন- যেমন কিছু লোক (দুই শ্রেণি বা ক্লাস বিশিষ্ট) জাহাজে আরোহন করল এবং লটারীর মাধ্যমে তাদের শ্রেণিবিভাগ হয়ে গেল। (উপরের শ্রেণিতে রান্নাবান্না ও পানি পান করার ব্যবস্থা রয়েছে) সুতরাং নীচের শ্রেণির লোকেরা উপরের শ্রেণির লোকদের কাছে গিয়ে পানি নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কষ্ট হয়। নীচের লোকেরা উপরের শ্রেণির লোকদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে কুঠার নিয়ে জাহাজের তলদেশ ছিদ্র করতে শুরু করে যাতে সাগরের পানি সংগ্রহ করা যায় এবং তাদের যেন উপরে যেতে না হয়। বিষয়টি লক্ষ্য করে উপরের লোকেরা বলতে থাকে কর কি? কর কি? নীচের লোকেরা উত্তর দেয়– 'আমরা উপরে গেলে তোমাদের কষ্ট হয় অথচ পানি ছাড়া আমাদের কোনো উপায়ও নেই।' এই উত্তর শুনে যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদের একাজ থেকে নিবৃত্ত করে তাহলে তাদেরকেও সমুদ্রে ডোবা থেকে উদ্ধার করবে এবং নিজেরাও প্রাণে বাঁচতে পারবে। আর যদি তারা (উপরের শ্রেণির লোক) তা না করে বা তাদেরকে ছেড়ে দেয় এবং (অর্থাৎ তারা যা খুশি তাই করুক) তাহলে তাদের এ ধরণের চিন্তাধারা বা কার্যকলাপের জন্য উভয় শ্রেণির লোকরাই সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"[১৫]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত– "রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন– যাদের মাঝে ব্যভিচার ও সুদ বিস্তার লাভ করল, তারা নিজেদের উপর আল্লাহর আযাব নামিয়ে নিল।"[১৬]

এই হাদীসের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, ব্যভিচার ও সুদের ব্যাপক প্রচলন খোদায়ী গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান বিশ্বে এই দুটির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে এবং ক্রমাগত তা বেড়েই চলেছে।

১৯৯০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর এবং চীন কার্যত বুর্জোয়া তথা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সমগ্র বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান অনুসংগ হলো সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা যার ভিত্তি হলো মানব চরিত্রের দুটি দুর্বলতা- দারিদ্রের ভয় ও বিনা পরিশ্রমে বিপুল লাভ অর্থাৎ ভয় ও লোভের সুযোগে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে। ফলে সুদ বিশ্বের অর্থনীতি এর মূল চালিকাশক্তি হিসাবে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবার এর

[১৫] সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-২৪৯৩; তিরমিজি শরীফ, হাদীস নং-২১৭৩।
[১৬] তারগীব ও তারহীব, হাদিস নং-২৭৭০; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস নং-৪৯৮১।

সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রধান দুটি রাজনৈতিক মতবাদ– গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

'গণতন্ত্র' হলো জনগণের শাসন হিসাবে কথিত এক ধরণের শাসন ব্যবস্থা। যার যেনতেন অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় যে কোনো পদ্ধতিতে জনগণকে আকৃষ্ট করে কোনো নির্দিষ্ট দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা। ক্ষমতায় গেলেই সেই দলের লোকদের সরকারের অধিকাংশ কাজের সঙ্গে বাস্তবে কোনো সম্পর্ক থাকেনা। আর এ মতবাদের পক্ষের ব্যাপক প্রচারণার ফলে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার চাপে ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা ধর্মীয় দর্শন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না।

সাধারণভাবে এই তিনটি মতবাদ গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই তিনটি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্ববাসীর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে এবং পৃথিবীব্যাপী সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস, ব্যভিচার সমান তালে মানবজাতিকে গ্রাস করে ফেলছে।

সুদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন–

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই লোকের মতো দণ্ডায়মান থাকে শয়তান স্পর্শ করে উম্মাদ করে দিয়েছে, এ কারণে যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়ও সুদের মতো। অথচ ক্রয়-বিক্রয়কে আল্লাহ বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করেছেন সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ (নিষিদ্ধতার ঘোষণা) এসেছে এবং সে (সুদ) পরিত্যাগ করেছে, তবে অতীতে যা কিছু হয়েছে তা তারই এবং তার বিষয়টি আল্লাহর অধীনে রয়েছে এবং যারা ফিরে যাবে (নিষেধাজ্ঞার পরও সুদ গ্রহণ করবে বা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের মতো মনে করবে), অতএব তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা সর্বদা থাকবে।" [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-২৭৫]

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

"এবং যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের জন্য মূলধন রইল। তোমরা কারো উপর অবিচার করোনা, আর কারো অবিচারের শিকার হয়োনা। হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাসী হয়ে থাক, তবে যে সুদ (মানুষের কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ত্যাগ কর। যদি তা না কর তবে ঘোষণা কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবস্থায় আছ।" [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-২৭৮-২৭৯]

উল্লিখিত আয়াতের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংক বা ক্ষুদ্র ঋণদাতা পাওনা আদায়ের তৎপরতা পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের প্রচারণা, দুনিয়াবী আলেমদের কোরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা আর ব্যাংকারদের প্রদর্শিত লোভ এই তিন শক্তির সম্মিলিত টানা পোড়নে মানুষ 'সুদ' আসলে কি তা বুঝতেই পারেনা। তাই ঋণী ও ধারের সঙ্গে সম্পর্কে রাসূল (দ.) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা জানলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে–

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে– "মহানবী (দ.)-এরশাদ করেছেন তোমাদের কেউ যখন কাউকে কোনো ঋণ বা ধার দেবে, তখন ঋণ গ্রহীতা কোনো উপহার-উপঢৌকন দিলে কিংবা নিজের যানবাহনে চড়িয়ে নিলে তাতে চড়বে না, উপঢৌকনও গ্রহণ করবেনা।"[১৭]

অর্থাৎ বর্তমান সময়ের হিসাবে কোনো ব্যাংক কর্মকর্তাকে যদি কোনো ঋণ গ্রহীতা তার বাসায় যাওয়ার জন্য তার গাড়ীতে Lift দেন তাহলে রাসূল (দ.)-এর দৃষ্টিতে তা 'সুদ' হিসাবে বিবেচিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এক লোককে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বললেন– "তুমি এমন জনপদে বসবাস করছ যেখানে সুদের বহুল প্রচলন রয়েছে। সুতরাং যখন কারও উপর তোমার কোনো প্রাপ্য (হক) থাকবে। সে তোমাকে ভূষির বস্তা কিংবা যবের বোঝা অথবা কিৎ (এক প্রকার ঘাস) এর দড়ি উপহার হিসাবে দিলেও (অর্থাৎ কোনো নগন্য বস্তু হলেও) তা গ্রহণ করোনা। কারণ তা (হবে) সুদ।"[১৮]

অর্থাৎ ঋণগ্রহণের দরুন ঋণ গ্রহীতার প্রতি অবনত হয়ে কিংবা তাকে সমীহ করে ঋণ গ্রহীতা যদি কোনো কিছু উপহার-উপঢৌকন অথবা স্বার্থ দান করে তাহলে তাও সুদ।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে– "রাসূল (দ.) অভিসম্পাত করেছেন, সুদের প্রতি, সুদখোরদের প্রতি, সুদদাতাদের প্রতি এবং সুদের সাক্ষীদের

[১৭] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৫২৬ (২৪৩২), সদাকা পর্ব, কর্জ অধ্যায়।

[১৮] সহীহ আল বোখারী, হাদীস নং-৩৮১৪; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-২৮৩৩।

প্রতি। তিনি আরও বলেছেন যে, এরা সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান। স্মরণ রাখতে হবে সকল ঐশী গ্রন্থসমূহেও সুদ সম্পর্কে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।"[১৯]

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন যে– "আমি রাসূল (দ.)-কে বলতে শুনেছি– যে সব লোক মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্যশস্য আটকে (গুদামজাত) রাখে (এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও লোকের কাছে তা পরবর্তীতে বেশি লাভের আশায় বিক্রয় করে না) তাদেরকে আল্লাহ কুষ্ঠ ব্যধি ও দারিদ্রের শাস্তি দান করেন।"[২০]

উল্লেখ্য, খাদ্য শষ্যের ব্যবসা করা জায়েজ এবং মওসুমের সময় খরিদ করে পরে দাম বাড়লে বিক্রী করাও জায়েজ। কিন্তু যখন মানুষের খাদ্য শষ্যের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সাধারণভাবে তা পাওয়া যায় না; তখন মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় ধরে রাখা পাপ (গুনাহ)।

মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (দ.) বলেছেন–

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোনো পাপ ক্ষমা করে দেন; কিন্তু পিতা-মাতাকে উত্যক্ত করার শাস্তি পৃথিবীতে মৃত্যুর পূর্বেই দিয়ে দেন।"[২১]

পবিত্র শরীয়তে আত্মীয় বাৎসল্যের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। বিভিন্নভাবে কোরআন ও হাদীসে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে আছে, রাসূল (দ.) বলেছেন–

"নিজের বংশধারা জেনে নাও, যাতে আত্মীয় বাৎসল্য সম্পাদন করতে পার। কারণ আত্মীয় বাৎসল্যের (সেলারেহমীর) দরুন পরিবারে প্রীতি সৃষ্টি হয়, সম্পদে উন্নতি হয় এবং মৃত্যু বিলম্বিত হয় (অর্থাৎ আত্মীয় বৎসল লোকেরা দীর্ঘজীবী হয়।"[২২]

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কারো সাহায্য-সহায়তা না করা হলে আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি দিয়ে থাকেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে–

রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন– "যার সামনে কোনো মুসলমান ভাইয়ের গীবত (পশ্চাত নিন্দা) করা হলো আর ক্ষমতা থাকায় সে তার ভাইয়ের

---

[১৯] মিশকাত শরীফ, ব্যবসা পর্ব, সুদ অধ্যায়, হাদীস নং-২৮০২; মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৫৯৮; তিরমিজী শরীফ, হাদীস নং-১২০৬।

[২০] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২২৩৮।

[২১] বায়হাকী শরীফ, শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

[২২] সহীহ তিরমিযী, হাদীস নং-১৯৭৯।

সাহায্য করল (অর্থাৎ, তার পক্ষ থেকে গীবতকারীকে উত্তর দিল এবং তার সাহায্য করল) দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করলে সে কারণে আল্লাহতালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে পাকড়াও করবেন।"[২৩]

এক হাদীসে বলা হয়েছে যে– "কোনো মুসলমান (ব্যক্তি) এমন অবস্থায় কোনো মুসলমানের সাহায্য পরিহার করবে যাতে তাকে অপমান অপদস্ত করা হচ্ছে; তখন আল্লাহতালা এমন জায়গায় তাকেও সাহায্যহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবেন। যেখানে সে সাহায্যের প্রত্যাশা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এমনি জায়গায় কোনো মুসলমানের সাহায্য করবে যাতে তার সম্ভ্রম খর্ব করা হচ্ছে এবং অপদস্ত করা হচ্ছে, আল্লাহতালা সেক্ষেত্রে তার সাহায্য করবেন। যেখানে সে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা করবে।"[২৪]

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, "রাসূল (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের সমর্থনে কোনো মুনাফেককে উত্তর দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহতালা একজন ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাবে। পক্ষান্তরে, যে কোনো মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করবে আল্লাহতালা তাকে দোজখের পুল (পুলসিরাত) এর উপর আটকে রাখবেন। যতক্ষণ না (আযাব ভোগ করে অথবা যার প্রতি দোষরোপ করেছিল তাকে সন্তুষ্ট করে) নিজের কথা থেকে ফিরে আসবে।"[২৫]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল (দ.)-এরশাদ করেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। কাজেই না একজন অপরজনের প্রতি জুলুম করতে পারে, না ধ্বংস হতে দেখতে পারে। আর যে লোক তার (ভাইয়ের) সাহায্যে নিয়োজিত হয়, আল্লাহ তার সাহায্য করেন। আর যে লোক কোনো মুসলমানের উৎকণ্ঠা দূর করে দেয়, আল্লাহতালা কিয়ামত দিনের উৎকণ্ঠাসমূহের মধ্য থেকে তার একটি উৎকণ্ঠা দূর করে দিবেন। যে লোক কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহতালা তার দোষ গোপন করবেন।"[২৬]

হযরত মুআয ইবনে জবল (রা.) বলেন– "আমি রাসূল (দ.)-কে বলতে শুনেছি, সামান্যতম রিয়াকারী (লোক দেখানোর জন্য সৎকাজ করা বা

---

[২৩] শরহুস্‌সুন্নাহ, হাদীস নং-৩৫৩০; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-৪৯৮০।

[২৪] আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৮৮৪; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-৪৯৮৩।

[২৫] মেশকাত শরীফ, হাদীস নং-৪৯৮৬; আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৮৮৩।

[২৬] বুখারী শরীফ, হাদিস নং-২৪৪২, ৬৯৫১; মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৫৮০; তিরমিজী শরীফ, হাদীস নং-১৪২৬; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-৪৯৫৮।

মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য বাহ্যিক ইবাদত/সৎকর্ম প্রদর্শনেচ্ছা) শিরক।" এবং তিনি আরো বলেছেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা করল, সে যেন স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মাঠে নামল।" তারপর তিনি বলেছেন– "নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎ বান্দাদেরকে বন্ধু হিসাবে গণ্য করেন। যারা পরহেযগার হয়ে থাকেন, আত্মগোপন করে থাকেন, তখন যেন তাদের অনুসন্ধান না হয় এবং উপস্থিত থাকলে যেন তাদেরকে অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ জানানো না হয় এবং তাদেরকে কাছে আনা না হয়। তাদের অন্তর হেদায়তের প্রদীপ। তারা (অন্তর্দৃষ্টির দরুন এমন) প্রত্যেক বিষয় (ফিতনা) থেকে বেঁচে থাকেন। যা পংকিলতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন।"[২৭]

এ হাদীসে প্রথমে রিয়াকারীর নিন্দা করা হয়েছে এবং রিয়াকারী শিরককারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। বান্দাকে যে কোনো কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। যদি মানুষের মাঝে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদেরকে অনুগত করার জন্য কিংবা তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করার জন্য কোনো কাজ করা হয় যেমন, নামাজ পড়ল বা রোজা রাখল অথবা যিকর, কোরআন তেলওয়াতে সময় ব্যয় করল কিংবা সদ্‌কা-দান-খয়রাত বিতরণ করল। তাহলে যদিও দৃশ্যত এগুলো সৎকর্ম বটে, কিন্তু লোক দেখানোর নিয়তের কারণে তা সৎ থাকেনা যেহেতু এ কাজের বিনিময় (খ্যাতি, সম্মান কিংবা দুনিয়া প্রাপ্তির আকারে) মানুষের কাছ থেকে সুবিধা নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করা হয়, সেহেতু একাজটি শিরক হয়ে যায়। আপতদৃষ্টিতে দেব-দেবীর পূজা অর্চনাকে যথা বড় শিরক (শিরকে আকবর) আর রিয়া লোক দেখানো হলো ক্ষুদ্র শিরক তথা (শিরকে আসগর)। এক হাদীসে রয়েছে যে–

"ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ল সে শিরক করল। যে লোক দেখানোর জন্য রোজা রাখল সে শিরক করল।"[২৮]

আল্লাহতালা শুধুমাত্র সে সব সৎকর্ম কবুল করেন যা শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়। কোনো আমল-কর্ম সম্পর্কে যদি এমন নিয়ত করা হয় যে, আল্লাহর থেকেও সওয়াব নেব, আবার মানুষের মাঝেও খ্যাতি লাভ হবে কিংবা কিছু অর্জন করা যাবে। তাহলে এ ধরণের কর্ম আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত।

---

[২৭] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৯৮৯; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-৫৩২৮; আর বায়হাক্বী শরীফ, শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

[২৮] মেশকাত শরীফ, হাদীস নং-৫৩৩১; মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬।

এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই মৌলানা রূমী বলেছেন– "যে এক মূহূর্ত আল্লাহর ওলীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করা ১০০ বছরের বেরিয়া ইবাদতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।"

আল্লাহর ওলীদের পরিচয় ও মর্যাদা

এই হাদীসে দ্বিতীয় বিষয় হলো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহতালার কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করল। সে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মাঠে নেমে এলো। এ বক্তব্য অন্য এক হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে– "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সঙ্গে শত্রুতা করবে আমি তাকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনাচ্ছি।" তাই আমাদের জানা প্রয়োজন যে ওলী কে বা কারা যাদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে আল্লাহতালা এতো স্পর্শকাতর; এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনই বা কি বলে। 'ওলী' শব্দের অর্থ বন্ধু। ওলী আল্লাহ, আল্লাহর বন্ধুত্বের সুবাদেই তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতালার বন্ধুত্ব অর্জন করার মাধ্যমেই তারা পৃথিবীর মালিকানা বা শাসনের অধিকারী হয়ে থাকেন। সাধারণভাবে আমরা জেনে আসছি নবী-রাসূলগণ আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রচার করে থাকেন। নবী-রাসূলগণ শুধু ধর্ম প্রচার করেন নাই; বরং তারা ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মানুষের শাসক বা নেতা বিষয়টি সর্বজন বিদিত থাকা সত্ত্বেও বিকৃত বা খণ্ডিত ইতিহাসের উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে আমরা বিভ্রান্ত। আল্লাহতালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে তার সৃষ্টির সর্বপ্রধান সৃষ্টি মানুষকে এই পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব তথা 'খেলাফত' দান করেছেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলেন তাঁর সবচেয়ে সফল অনুসারী বান্দা তথা বন্ধু যাদের সাধারণ পদবী নবী ও রাসূল-অবতার-ঋষি, মুনি, সেইন্ট ইত্যাদি।

এ কারণেই আমরা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক ধরণের শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ পাই তাহলো Theocracy বা ঈশ্বরতন্ত্র বা ঐশীতন্ত্র। এই শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ বা ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিরাই রাজ্য শাসন করে থাকেন। এই শাসকগণ ঐশী বিধি-বিধান জারী, ব্যাখ্যা ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে এই ঐশী শাসন কায়েম করেন। এই ধরণের শাসন কর্তৃত্ব চীন, ব্যবিলন, মিশর, ভারতসহ পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। তবে পৃথিবীর মানুষরা সহজে এই শাসন মেনে চলতে রাজী হয় নাই। তাই অনেক সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই প্রকৃত ঐশী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে হত্যা করে বা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে সাধারণ মানুষ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সহায়তায় নিজেরাই অবৈধ শাসক হয়ে স্রষ্টার নামে মানুষকে

বিভ্রান্তি ও তাদের অন্যায় ভাবে জোর-জুলুমের মাধ্যমে শাসন করছে। এবং তাদের মনগড়া আইন-কানুন তারা আল্লাহর নামে চালু করেছে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্ম ও রাজনীতি নামে যে দুইটি বিষয় চালু করা হয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ ও নেতা রয়েছে বলে যেমন আমরা মনে করে থাকি এটি একটি আধুনিক চিন্তার নতুন সংস্করণ। প্রকৃতপক্ষে এই বিভাজন কোনো ধর্মীয় বিভাজন নয়; বরং প্রকৃত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের হাত থেকে অবৈধ পদ্ধতিতে আধুনিক পরিভাষায় রাজনৈতিক বা সামরিক শাসকদের ক্ষমতায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত পক্ষে সকল ধর্মের মূল দাবি হলো সৃষ্টিকর্তা প্রবর্তিত শাসন কর্তৃত্ব (ধর্ম) তাঁর নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজে প্রয়োগ পদ্ধতি, এটাই ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা।

এ কারণে সমাজে পথ চলতে গেলে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড অর্থাৎ জন্মের পর থেকে করণীয় সকল কর্মকাণ্ড এমন কি থুথু ফেলার পদ্ধতি থেকে শুরু করে যুদ্ধ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম ও পদ্ধতি ঐশী নির্দেশনায় পরিচালিত হতে হবে। পক্ষান্তরে রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে হলে যে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা প্রয়োজন এবং সে ব্যাপারে সকল প্রকার বৈধ-অবৈধ বাধা অপসারণের লক্ষ্যে যা যা করা প্রয়োজন তাই রাজনীতি। এ ব্যাপারে মূল লক্ষ্য হলো– "ধর্ম রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করবে, না রাজনীতি ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে।" হাজার হাজার বছরের এই সংগ্রামে ধর্ম পরাজিত হয়েছে এবং রাজনীতি ধর্মকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে আর এই মতবাদ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী- জনগণ, রাজা, সম্রাট, শাসকগোষ্ঠি, পার্লামেন্ট ইত্যাদি পরিভাষার সম্বলিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তব অস্তিত্ব সমাজ থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

আর এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে যখন ধর্মীয় নেতা চ্যালেঞ্জ করেছেন তখন তা রাষ্ট্রবিরোধী খেতাবে পর্যবসিত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে কারবালা যুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মীয় তথা ঐশী প্রতিনিধির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের তথা অপশক্তির বিজয় সূচিত হয়েছে যা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইউরোপে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের উপর রোমান শাসকগণ যে নিপীড়ন চালিয়েছেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তীতে রোমান সম্রাট কনস্টাইনটাইন ৩২৬ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এতে খ্রিস্টানগণ রাজশক্তিতে বলীয়ান হন। পরবর্তীতে সাধারণ মানুষ একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জুলুম ও ধর্মীয় অনাচারের

শিকার হয়। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন (Religious Reformation)-এর ফলশ্রুতিতে তাত্ত্বিক ভাবে বিভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তির পরাজয় ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির বিজয় সূচিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় ধর্মকে রাজশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয় আর ধর্মের এই বন্দীত্বকে বিভিন্ন বাদ, মতবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইজম এর মাধ্যমে যতভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন করা যায় তার উপায় পদ্ধতি বর্তমানেও অব্যহত রয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন–

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أُمَماً مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ
وَبَلَوْنَاهُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا
ٱلأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ
يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لاَّ يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ
وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

"এবং আমরা পৃথিবীতে তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি তাদের কতক সৎকর্মপরায়ন আর কতক অন্য রকম (অবাধ্য ও দুষ্কর্মপরায়ন) এবং আমরা তাদের ভালো (নিয়ামত) ও মন্দ (বিপদাপদ) দ্বারা পরীক্ষা করেছিলাম যাতে তারা (সত্যপথে) ফিরে আসে। অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী তাদের স্থলাভিসিক্ত হিসাবে ঐশী গ্রন্থের (ধর্মীয় নেতৃত্বের) উত্তরাধিকারী হলো এ অবস্থায় যে, (আল্লাহর বিধান পরিবর্তন/বিকৃত সাধন/ভুলভাবে উপস্থাপনের বিনিময়ে পার্থিব) তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করত এবং বলত যে, অতি শীঘ্র আমাদের ক্ষমা করা হবে।" আবার যদি তাদের নিকট অনুরূপ সামগ্রী আসে তবে তারা তাও গ্রহণ করবে। তাদের নিকট হতে সত্য গ্রন্থের দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না এবং তারা তাতে ঐশী গ্রন্থে যা আছে তা উত্তম রূপে অধ্যয়নও করেছিল। আর পরকালের বাসস্থানই তো পরহেযগারদের জন্য উত্তম। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করবেনা।" [সূরা ০৭ আরাফ, আয়াত-১৬৮-১৬৯]

উল্লিখিত কুরআনের বাণী থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অবৈধ পদ্ধতিতে ধর্মের উত্তরাধিকারী হয়ে বসেছিল যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া বিশ্বে চলমান থাকবে বা থাকতে পারে। আর আল্লাহতায়ালার নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে জনগণকে নিয়ে বাধা প্রদান করবেন এবং কোনোক্রমেই আপোস করতে পারবেন না। ক্ষেত্র বিশেষে তারা আপাত দৃষ্টিতে পরাজিত ও শহীদও

হতে পারেন কিন্তু আত্মসমর্পন করবেন না। যা ইসলামের ইতিহাসে কারবালা প্রাঙ্গনে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে জান্নাতী যুবকদের সরদার হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনার মাধ্যমে দেখতে পাই।

এ প্রেক্ষিতে 'ইমাম' পদবী সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, (সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-১২৪) যে আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলদের মূল দায়িত্ব বোঝাতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 'ইমাম' ও দাউদ (আ.)-কে 'খলিফা' (সূরা ৩৮ সা'দ, আয়াত-২৬) পদবীতে ভূষিত করেন। এতে আমরা স্থির নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, আমাদের বিবেচনায় নবী-রাসূলের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুমাত্র ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁরাও সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পরিচালনার কাজে নিয়োজিত। অর্থাৎ এরা হলেন আল্লাহর নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব নেতা বা প্রশাসক। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই যে রাসূল (দ.) গাদীরে খুম নামক স্থানে ১৮ই জিলহজ্ব বিদায় হজের শেষ ভাষণ দেন।

রাসূল (দ.)-এর বিদায় হজের শেষ ভাষণ ও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ইসলামের ইতিহাস পুস্তকসমূহে ১০ই জিলহজ্বে আরাফাতের মাঠে রাসূল (দ.) যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাকেই বিদায় হজ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (দ.) ১০ই জিলহজ্ব বিদায় হজ সম্পন্ন করার পর 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে ১৮ই জিলহজ্ব তারিখেও এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবে ধারাবাহিক সনদের মূলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানব জাতির দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহ সাধারণভাবে এই ভাষণের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করে নাই। তাই বিষয়টি সর্বজন বিদিত নয় এবং বাস্তব জীবনে মুসলমান উম্মাহ এই ভাষণের মূল শিক্ষা কার্যত অস্বীকার করে জাতিগতভাবে এক মহা বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে এবং এই ধর্মের রাজনৈতিক মতবাদ Theocracy বা ঐশীতন্ত্র ধর্মীয়ভাবে বাদ দিয়ে নতুন ধরণের রাজনৈতিক মতবাদ সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধর্মে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কোনো ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমনকি কোনো কোনো মুসলিম বুদ্ধিজীবীও ইসলাম বিরোধী ব্যক্তিবর্গ দাবি করে থাকেন মুসলমানগণ যে তাদের ধর্মকে Complete code of Life বলে থাকে তা একটি অবাস্তব ধারনা। যদি এ ধারণা সত্য হতো তাহলে ইসলাম ধর্মে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় ইসলামের প্রাথমিক দিকেই এতো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনা করত না এবং এই প্রক্রিয়ায় রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র মুসলমান সমাজে জেঁকে বসত না। এই সব শাসক গোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের আর্থ-সামাজিক কল্যাণমূলক ও যেসকল সংস্কারমূলক কর্মসূচী পবিত্র কুরআন ও রাসূল (দ.) ঘোষণা করেছিলেন তা কার্যত বাতিল বা অকার্যকর করে দিয়েছে। ফলে মুসলমান জাতি হিসেবে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে সমাজের দারিদ্র বিমোচনে যাকাত আদায় ও বিতরণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত ইবাদতে পর্যবসিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের উন্মুক্ত আলোচনা সমালোচনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে বাক স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। কুরআন হাদীসের রাষ্ট্রীয় ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য সব ব্যাখ্যা বাতিল ঘোষণা করে শত শত সূফী/সৎলোককে খুন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। আর এসব

কারণেই খোদায়ী গজব হিসাবে বর্তমানে মুসলমান উম্মাহ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের কার্যত সেবাদাস হিসাবে কালাতিপাত করছে, ফলে ইসলামের দণ্ডবিধি পৃথিবীর কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে চালু নাই। রাসূল (সা.)-এর গাদীরে খুমের ঘোষণা সম্পর্কে আল কুরআন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

"হে রাসূল! পৌছে দিন (ঐ বিষয়টি যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে। আপনি যদি তা না করেন তাহলে আপনি তাঁর রেসালতের কোনো কিছুই পৌছালেন না। আর (ভয়ের কোনো কারণ নেই) আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়ত করেন না।" [সূরা ০৫ মায়েদা, আয়াত-৬৭]

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত এই হুকুম যা প্রচার করার জন্য রাসূল (দ.)-কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা ভিন্ন মাত্রার এবং সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর তা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ যা উম্মাহকে জানানো না হলে রেসালতের সমস্ত শিক্ষা অকার্যকর বা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ এই আয়াতটি 'নবুয়ত' ও 'রেসালতের' সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আর এ কারণে এই হুকুম প্রতিপালন না করা হলে রেসালতের মিশন কার্যত অকার্যকর হয়ে যাবে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠি কার্যত রেসালত অস্বীকারকারী হয়ে খোদার গজবের সম্মুখীন হবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, রেসালতের শিক্ষা আল্লাহতালার হেদায়তের প্রক্রিয়ায় একটি ধারাবাহিক বিষয় অর্থাৎ এই পৃথিবী কোনোক্রমেই এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারবে না। কারণ আল্লাহতালা মানবজাতির কাছে এই মর্মে ওয়াদা করেছেন যে, রেসালতের শিক্ষা তিনি মানবজাতির কাছে অবশ্য অবশ্যই পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন। হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় বলেছিলেন–

قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"আমরা বলেছিলাম, এখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ কর পরে (যখন) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যে পথ নির্দেশনা যাবে এবং যে তার অনুসরণ করবে তাদের (কিয়ামতে) না কোনো ভীতি থাকবে, আর না তারা দুঃখিত হবে।" [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-৩৮]

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের মর্মানুযায়ী জানা গেল যদিও রাসূল (দ.) আমাদের মাঝে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকবেন না। কিন্তু রেসালতের শিক্ষা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ও রাসূল (দ.) কর্তৃক তা ঘোষিত হতে হবে এবং এই শিক্ষা আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তি বর্গের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত প্রচার হতে থাকবে। অর্থাৎ রেসালতের এই শিক্ষা কে বা কাদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে গাদীরে খুমে রাসূল (দ.) প্রকৃত পক্ষে এই ঘোষণাই দিয়েছেন। তাই এই ভাষণটি পর্যালোচনা করলে এই মহাসত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

পবিত্র কোরআনের বর্ণিত নির্দেশের আলোকে রাসূল (দ.) হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের বাহু স্বীয় পবিত্র হাতে ধরে তাবু থেকে বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে দাড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার পর উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন–

> "আলাসতু আউলা বিকুম মিন আন ফুসিকুম অর্থাৎ- আমি কি তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখিনা? তারা সকলে বল্লেন, বালা ইয়া রাসূলুল্লাহ, অর্থাৎ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতি আমাদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখেন।" এই অঙ্গীকার নেয়ার পর রাসূল (দ.) নিজের বরকতময় মুখে বল্লেন, মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু। আল্লাহুম্মা ওয়ালি মানওয়অলাহু ওয়া আদিমান আদাহু ওয়ানসুল মান নাসারাহু ওয়ায জাল খাজালাহু" অর্থাৎ আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি তাকে বন্ধু গন্য কর, যে একে (আলীকে) বন্ধু গন্য করে এবং তাকে শত্রু গন্য করো, যে একে শত্রু গন্য করে এবং তাকে সাহায্য করো, যে একে সাহায্য করে এবং রাগন্বিত হও তার প্রতি, যে একে রাগান্বিত করে।"[২৯]

এই সব হাদীসের মর্মানুযায়ী সর্ব প্রথম রাসূল (দ.)-এর সঙ্গে তাঁর সাহাবী বা উম্মতের সম্পর্ক কি তা বোঝা গেল। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের প্রানের উপরে রাসূল (দ.) ক্ষমতাবান। অর্থাৎ রাসূল (দ.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর যে কোনো উম্মত প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য। এ কারণেই তিনি রাসূল (দ.) সকল মোমিনগণের মাওলা-প্রভু-মালিক-নেতা-আমির ইত্যাদি। আর এই ঘোষণার মাধ্যমে হযরত আলী (কা.)-কেও এই একই ক্ষমতা আল্লাহর তরফ থেকে দান করা হলো। তাই হযরত আলী (কা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সকল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আত্ম বিসর্জন দেওয়া ফরজ করে দেওয়া হলো। আর এই

[২৯] দুররে মানসুর, জালালউদ্দীন সুয়ূতী; সাওয়াকে মুহারিকা।

ঘোষণার মাধ্যমে রাসূল (দ.) রেসালতের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক (আমাদের ভাষায়) ক্ষমতা হযরত মাওলা আলীর উপর বর্তায়।

হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বিভিন্ন ভাবে এই বার্তাই পৌছে দিয়েছেন, যেভাবে তিনি আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন–

"হে উপস্থিত জনতা, যা কিছু তিনি নাজিল করেছেন, সেগুলো পৌঁছে দেয়াতে আমি কোনো কার্পণ্য করিনি। আর এখন আমি এ আয়াতের শানে নুযুলও তোমাদের জন্য স্পষ্টাকারে ব্যক্ত করছি। এর আগে জিবরাইল আমার নিকট এ হুকুমটি তিনবার নিয়ে এসেছেন। আমার প্রভুর পক্ষ থেকে সালামসহ যিনি নিজেই সালাম ও সালামের উৎস, আমি যেন এ স্থানে দাঁড়িয়ে যাবতীয় কালো ও সাদাকে এ সংবাদ দেই যে, আলী ইবনে আবি তালেব হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসি, আমার খলিফা ও আমার পরবর্তী ইমাম। আমার সঙ্গে তাঁর মর্যাদা ও সম্পর্ক তদ্রুপ যেমন নবী মুসার সঙ্গে হারুনের ছিল। পার্থক্য কেবল এই টুকু যে, আমার পরে আর নবী হবেনা। আল্লাহ ও আমার পরে আলী তোমাদের অভিভাবক। আর আমি জিবরাইল (আ.) নিকট ইচ্ছা ব্যক্ত করে ছিলাম যে, আল্লাহ যেন এই হুকুমটি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া থেকে আমাকে ক্ষমা করেন। কারণ আমি জানি যে, খোদাভীরুদের সংখ্যা অনেক কম আর মুনাফিকদের সংখ্যা অধিক। আর গুনাহকারীদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা আর ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল। এরা হলো সে সকল মানুষ যাদের আলোচনা আল্লাহ এভাবে করেছেন; তারা আপন জিহ্বা দ্বারা তাই বলে থাকে যা তাদের হৃদয়ে থাকেনা। আর তারা সেগুলোকে অতি সাধারণ কথা মনে করে অথচ আল্লাহর কাছে তা অনেক কঠিন বিষয়।

হে লোক সকল, জেনে রাখো যে, আল্লাহ অবশ্যই আলীকে তোমাদের জন্য এমন ওলি ও ইমাম মনোনীত করে দিয়েছেন যার আনুগত্য করা মুহাজির আনসার এবং তাদের প্রতি ওয়াজিব যারা উত্তম কাজে তাদেরকে অনুসরণ করে এবং তাদের প্রতিও যারা জঙ্গলে বাস করে আর তাদের প্রতিও যারা শহরে বাস করে। তদ্রুপ প্রত্যেক অনারব আর প্রত্যেক আরবের প্রতি, প্রত্যেক স্বাধীনের প্রতি ও প্রত্যেক দাসের প্রতি, প্রত্যেক ছোট ও প্রত্যেক বড়র প্রতি, প্রত্যেক কালো ও প্রত্যেক সাদার প্রতি এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতিও আবশ্যক যারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান রাখে। তারই নির্দেশ জারী হবে, তার কথা মান্য করা ওয়াজিব হবে। তারই আদেশ কার্যকরী হবে। যে তার বিরোধিতা করবে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ আসবে। রহমতের হকদার সেই হবে তাকে যে অনুসরণ করবে এবং যে তার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করবে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ মাগফিরাতের যোগ্য

বলে ঘোষণা করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকেও যে আলীর কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।

হে জনমণ্ডলী, এটাই হলো শেষ অবস্থা আর শেষবারের ন্যায় সুযোগ যে, আমি সবার সামনে তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করছি। তার কথা শুনো ও আনুগত্য করো এবং নিজ প্রভুর হুকুম মান্য করো। যেহেতু আল্লাহ জাল্লা শানুহু তোমাদের ইলাহ্ ও ওলী। তারপর তাঁর রাসূল মুহম্মদ (দ.) তোমাদের ওলী, যে তোমাদের সঙ্গে স্পষ্টাকারে কথা বলে। তারপর যিনি তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহর হুকুম অনুসারে আলীও তোমাদের ওলী ও ইমাম। অতঃপর কিয়ামত দিন পর্যন্ত আমার ইমামত আমার বংশ ধারায় জারি থাকবে যা এর (আলীর) ঔরস থেকে হবে। এ ধারাবাহিকতা ঐ দিন পর্যন্ত জারী থাকবে যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আখেরাতে উপস্থিত হবে।

এরপর এও জেনে রেখো যে, সেই হলো প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে আর রাসূলের প্রতি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। আর রাসূলের সঙ্গে থেকে এমন অবস্থায় আল্লাহর এবাদত করত যে, সে ছাড়া পুরুষদের মধ্য থেকে আর কেউ রাসূলের সঙ্গী ছিলনা।

হে উপস্থিত জনতা, তার ফজিলতকে অভিনন্দন জানাও, যেহেতু আল্লাহ তাকে ফজিলত দান করেছেন, আর তার ইমামতকে মান্য করো যেহেতু আল্লাহ তাকে ইমাম নিযুক্ত করেছেন।

হে লোক সকল, সে হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমাম। আর আল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তির তওবা কবুল করবেন না, যে তার ইমামতকে অস্বীকার করবে আর কষ্মিনকালেও তাকে তিনি মাফ করবেন না। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনই হবে যে, যে ব্যক্তি আলীর হুকুমের বিরোধিতা করবে, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন, যে তাকে চিরকালের জন্য কঠিন আজাব দিবেন। কাজেই তোমরা তার বিরোধিতা করা থেকে বাঁচো, যাতে ঐ আগুনে ঝাঁপিয়ে না পড়ো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।

হে জনমণ্ডলী, আল্লাহর কসম পূর্ববর্তী নবীদের নিকট আমারই আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল আর আমিই সকল নবী ও রাসূলের সর্বশেষ ও সকল মখলুক তথা সৃষ্টির জন্য সর্বপ্রথম হুজ্জত বা দলিল। কাজেই যে ব্যক্তি আমার এ কথার প্রতি সন্দেহ পোষণ করবে সে সব কিছুর, প্রতিই সন্দেহ পোষণ করবে। আর সে যাবতীয় বস্তুর প্রতি সন্দেহ পোষণ করল, তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত আছে।

হে লোকসকল, এছাড়া আর কিছু নয় যে, আল্লাহ জাল্লাশানহু আপন দ্বীনকে ইমামতের সঙ্গেই পূর্ণতা দান করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি একে (আলীকে

ইমাম বলে মানবে না, আর এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আমার সন্তান এবং এর (আলীর) ঔরস থেকে যারা এর স্থলাভিষিক্ত হবে, তাদেরকেও ইমাম না মানে তাহলে তাকে যখন আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে, তখন সে তাদের অর্ন্তভূক্ত হবে যাদের যাবতীয় আমল ধ্বংস ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের আজাবে কোনো কমতি করবেন না, আর তাদের কোনো অবকাশও দেয়া হবেনা।

আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক এমন কোনো আয়াত নাই যা তার শানে নাজিল হয়নি। আর মুমিনদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ কোনো স্থানেই আহ্বান করেননি; বরং মূল আহ্বান তার প্রতিই করেছেন; বরং কোরআন মজীদের প্রশংসার এমন কোনো আয়াত নাই যা তার শানে নাজিল হয়নি। আর আল্লাহ সূরা 'দাহর' এ বিশেষ করে তারই জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন আর উক্ত সূরা তার ছাড়া অন্য কারো শানে নাজিল হয়নি। আর সে ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা সেখানে করেননি।

হে মানব সকল, সে হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়দানকারী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিগ্রহকারী, সে হলো পবিত্র আর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য মনোনীত এবং নিজে হেদায়েত প্রাপ্ত। তোমাদের নবী সর্বোত্তম নবী এবং তোমাদের ওয়াসি সর্বোত্তম ওয়াসি। আর সর্বোত্তম ওয়াসীরা তার সন্তানদের মধ্য থেকেই হবে।

হে উপস্থিত জনতা, প্রত্যেক নবীর বংশধারা তাদের নিজেদের ঔরসের মাধ্যমে, আর আমার বংশধারা আলীর ঔরসের মাধ্যমে।

হে লোকসকল, ইবলিস আদমকে বিদ্বেষের ফলে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে কাজেই তোমরা আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করোনা। নতুবা তোমাদের সমস্ত আমল ধ্বংস ও নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। আদমকে কেবল একটি ভুলের কারণে জমিনে নামানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা ছিলেন। তাহলে তোমাদের অবস্থান কেমন হবে। যে অবস্থায় তোমরা আছ ও যা কিছু তোমাদের রয়েছে আর তোমাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক আল্লাহর শত্রুও রয়েছে।

সাবধান থেকো, পাষাণ হৃদয় ব্যতীত আলীর প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করবে না। আর আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি ব্যতীত আলীর কেউ বন্ধু হবেনা। খাস মুমিন ব্যতীত কেউ তার প্রতি ঈমান আনবে না। আল্লাহর কসম, আলী সম্পর্কেই আল্লাহতায়ালা 'সুরা আসর' নাজিল করেছেন। "পরম করুণাময় আল্লাহর নামে যিনি অসীম করুণাময় ও দয়াশীল। মহাকালের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পর হক ও ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে"

হে জনমণ্ডলী, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং স্বীয় রেসালত তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। আর রাসূলের দায়িত্ব স্পষ্ট রূপে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হে উপস্থিত জনতা, অতি সত্তর আমার পরে এমন লোকেরা নেতা হবে, যারা তোমাদের জাহান্নামের প্রতি আহ্বান করবে। আর কেয়ামত দিবসে তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

হে লোকসকল, আল্লাহ ও আমি উভয়েই তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তারা ও তাদের বন্ধুগন্যকারী আর তাদের অনুসারী ও তাদের সাহায্যকারী জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অহঙ্কারকারীদের আবাস তো এমনই খারাপ হবে।

জেনে রাখো যে, এ সব লোকই কেতাব লেখক হবে। এবার তোমরা ঐ লেখাগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করো।

হে মানব সকল! আমি **ইমামত** ও **উত্তরাধিকার** এ দুটি বিষয়কে কিয়ামত পর্যন্ত আপন বংশধারায় রেখে যাচ্ছি। আর আমার প্রতি যে কথা পৌঁছে দেয়ার আদেশ হয়েছিল সে কথা আমি পৌঁছে দিয়েছি। যেন প্রমাণ হয়ে যায়, উপস্থিত আর অনুপস্থিতদের প্রতি এবং ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি যারা এখানে রয়েছে, আর যারা উপস্থিত নাই এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি যারা জন্মগ্রহণ করেছে আর যারা জন্মগ্রহণ করেনি। সে জন্য প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তির অবশ্যই কর্তব্য হবে যেন নিজ সন্তানের নিকট এ সংবাদটি পৌঁছে দেয়। আর এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত এ ভাবেই অব্যহত থাকবে। আর যারা অদূর ভবিষ্যতে এটাকে জবর দখলের রাজত্ব বানিয়ে নেবে।

জেনে নাও, আল্লাহ জবর দখলকারীদের এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি অভিশাপ করবেন।

আর হে উভয় দলভুক্তরা, আমি তখন তোমাদের হিসাব নেয়ার জন্য (তোমাদের দায়-দায়িত্ব থেকে) দ্রুতই মুক্ত হয়ে যাব। তারপরে দু'দলের প্রতিই অগ্নিশিখা এবং গলিত (উত্তপ্ত) তামা পাঠানো হবে, তা তোমাদের দু'দলের কেউই ঠেকাতে সক্ষম হবেনা।"[৩০]

রাসূল (দ.)-এর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (দ.)-এর দুই ধরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি রেসালতের

[৩০] **বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণ**, মূল: আল্লামা আবু মনসুর আহমদ ইবনে আলী আত-তাবাবসী (রহ.), ভাষান্তর: ইরশাদ আহমদ, সম্পাদনায়: ক্বারী মীর রেজা হোসাইন শহীদ, আলে রাসূল পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খৃষ্টাব্দ।

দায়িত্ব যা ইমামত তথা ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড যা ঐশী শক্তি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অন্যটি দৃশ্যমান রাজনৈতিক ক্ষমতা বা দুনিয়াবী প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। ঐশী ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনা কৌশলের দাবি হলো এই দুই ধারা একই ব্যক্তির মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালিত হবে। নবুওত-বেলায়েত-ইমামত এটি আল্লাহর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যটি আল্লাহর দেওয়া মানবীয় স্বাধীনতার অধীন। অর্থাৎ আল্লাহ জোর পূর্বক তা মানুষের উপর চাপিয়ে দেননা। তবে যদি জনগণ মানবীয় বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে যদি এই ঐশী প্রশাসন ব্যবস্থা না মানে তাহলে দুনিয়া পরিচালনার আইন অনুযায়ী তারা দুনিয়ায় গজব ও আখেরাতে আযাবের সম্মুখীন হবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, রাসূল (দ.)-এর ওফাতের পর তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদ চালু করা হয়। ঐশী 'ইমামত' ও পার্থিব শাসন ক্ষমতা একীভূত করার সর্বশেষ চেষ্টা হিসাবে হযরত ইমাম হোসেন কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। ফলে প্রকৃত ইসলামি শাসনের যে অবসান ঘটে তা থেকে মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয় নাই। ফলে মুসলিম জাতি বর্তমানে অধঃপতনের প্রায় শেষ সীমায় পৌছে গেছে। অথচ তাদের রোগ এই যে, পার্থিব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঐশী নির্দেশনার কার্যত অনুপস্থিতিই বিশ্বের মুসলমানদের এই মহা বিপর্যয়ের প্রধান কারণ তা তারা বিশ্বাস করতে, বুঝতে বা জানতে পারছেনা। যাহোক, ইমামতের উত্তরাধিকারীত্ব রাসূল (দ.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী রাসূল (দ.)-এর পবিত্র আহলে বাইয়াতের হাতে ন্যাস্ত যা আল্লাহর সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন এবং তাদের কার্যকলাপ অনেক ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে প্রচলিত শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতা বহির্ভুত। যেমন নাকি আমরা পবিত্র কোরআনের সূরা কাহফের হযরত খিজির (আ.) ঘটনায় জানতে পারি।[৩১]

যাহোক, আল্লাহ তালার এই এক শ্রেণির বান্দা রয়েছেন তারা আল্লাহর এমনই প্রিয়পাত্র ও আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহতালার বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাই তাঁরা বাহ্যিকভাবে কোনো রাজা বা সম্রাটকে কোনো রকম তোয়াক্কা করেন না; বরং অনেক পার্থিব রাজা-মহারাজা এদের কাছে দোয়া প্রার্থী হয়ে বা এদের মুরীদ হয়ে দুনিয়াবী অনেক কল্যাণ হাসিল করেছেন। যেমন দিল্লীর সুলতান শামস উদ্দিন ইলতুতমিস, যিনি হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মুরীদ ছিলেন। সুলতান মাহমুদ

[৩১] সূরা ১৮ কাহাফ, আয়াত-৬০-৮২।

গজনী হযরত খারকানী (রহ.)-এর দোয়া প্রাপ্ত ছিলেন। আবার অনেক রাজা-বাদশাহ এদের অসন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে খোদায়ী গজবের শিকার হয়ে অকাল মৃত্যু বা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ও ভারতের ইতিহসে হযরত খাজা মঈনউদ্দিন (রহ.)-এর সঙ্গে বিরোধিতা করে পৃথ্বিরাজ প্রথমে রাজ্যহারা পরে প্রাণ হারান। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহ.)-এর সঙ্গে বিরোধিতা করে গিয়াস উদ্দিন তুঘলক প্রাণ হারান। অনুরূপভাবে সিলেটের হযরত শাহজালারের সঙ্গে বিরোধিতা করে গৌর গোবিন্দ রাজত্ব ও প্রাণ উভয় হারান।

'ওলী' শব্দটি আরবি অ'লা শব্দ হতে আগত যার অর্থ নৈকট্য লাভ, প্রেম, মুহাব্বত, ভালোবাসা। ফাওয়ায়েদুল ফেকাহ কিতাবে আল্লামা মুফতি সৈয়দ আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন, অলী হলেন যিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু ভুলে গিয়ে তাঁরই প্রেমে নিজের সবকিছু বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে স্থায়ী জীবনের মালিক হয়েছেন। আবার বলা হয়েছে 'বেলায়েত' তথা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী হলো ওলী। আল্লাহতালার এই বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা ওলী সম্পর্কে পবিত্র কোরআন–

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ
ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ
لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ
ذٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

১. জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুদের (ওলীদের) না ভীতি থাকবে আর না তারা দুঃখিত হবে। (তারা সে সব মানুষ) যারা বিশ্বাস করে আর সাবধানতা অবলম্বন করে। তাদের জন্য ইহকালের জীবনে ও পরকালের সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর বাণীসমূহের (প্রতিশ্রুতি ও সৃষ্টিগত নিয়মের) কোনো পরিবর্তন হয়না। এটাই তো মহাসাফল্য। [সুরা ১০ ইউনুস, আয়াত-৬২-৬৪]

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِن لاَّ تَشْعُرُونَ

২. যারা আল্লাহর পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে তাদেরকে মৃত বলোনা; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারনা। [সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৪]

وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

৩. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনও মৃত মনে করোনা; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকা পেয়ে থাকে।
[সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-১৬৯]

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ
إِلاَّ مَوْتَتَنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ

৪. আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদের উপর শাস্তিও দেওয়া হইবেনা। ইহাই তো মহাসাফল্য। এই রূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত। [সূরা ৩৭ সাফ্ফাত, আয়াত-৫৮-৬১]

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً

৫. আল্লাহ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তাহার কোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না। [সূরা ১৮ কাহফ, আয়াত-১৭]

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ ٱلْمُتَّقُونَ

৬. খোদা ভীরুরাই হলেন তার ওলী। [সূরা ০৮ আনফাল, আয়াত-৩৪]

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, এই সব বান্দারা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যারা মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত। যাদের সান্নিধ্য ছাড়া আল্লাহ মানুষকে হেদায়েত দান করেন না। তাঁরা আপাত দৃষ্টিতে মৃত্যু বরণ করলেও তাদেরকে মৃত মনে করা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তাদের জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়– "কোথা সে আরেফ অভেদ যাহার জীবন-মৃত্যু জ্ঞান।"

তাই এ সব মহামানবের কাছে হেদায়েতের জন্য যাওয়া আল্লাহরই নির্দেশের আওতাভুক্ত। যেহেতু তাদের মৃত্যু নাই, তাই তাদের মাযারে দোয়া বরকত, মাগফেরাত ও সাহায্যের জন্য যাওয়ার কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা শুধুমাত্র অজ্ঞ মূর্খদেরই কাজ। তবে তাঁদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা শয়তানের কাজ হিসাবেই বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু তারা আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাই তাদের কাছে যাওয়া বা চাওয়ায় শির্ক বেদআতের প্রশ্ন অবান্তর। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> রাসূল (দ.)-এরশাদ করেন– "আল্লাহতালা বলেন– যে কেউ আমার কোনো অলী তথা বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার কোনো বান্দা আমার নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা হলো তার উপর অর্পিত ফরজ ইবাদত। আর আমার কতিপয় বান্দা নফল তথা অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে ফলে আমি

তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে প্রিয় বান্দা যদি আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করল অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। সে যদি আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি।"[৩২]

রাসূল (দ.)-এরশাদ করেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তালা তাদের শপথ সত্যে পরিণত করেন।"

আল্লাহতালা পবিত্র কোরআনে নবীদের মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন–

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"এরা রাসূল আমি তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর মর্যাদা (শ্রেষ্ঠত্ব) দান করেছি"। [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-২৫৩]

অর্থাৎ কোনো কোনো হযরত অপেক্ষা অন্যজন অধিক মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠ। যদিও নবুয়তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নবুয়তের গুণের মধ্যে সবাই কিন্তু বৈশিষ্টাবলী এবং কামালাতের মধ্যে মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহতালা এক এক জনকে এক এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী আউলিয়ায়ে কেরামকে মর্যাদার দিক দিয়ে বার ভাগে বা ১২টি পদবীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১. 'গাউসুল আযম' এটি বেলায়তের সর্বোচ্চ মর্যাদার উপাধি-পদবী। এ পদের আরেকটি নাম 'মুফরাদান'। এ পদে অধিষ্ঠিত আউলিয়ায়ে কেরামের ক্ষমতা ও পদ কোনো যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং স্থায়ী এবং সর্বকালের। সকল স্তরের আউলিয়া কেরামের উপর তাঁদের মর্যাদা। দৃশ্য-অদৃশ্য জগতের পরিচালনার চাবিকাঠি মূলত তাদেরই হাতে অর্পিত। এ সম্পর্কে হযরত বড়পীর শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কসিদা শরীফে নিজেই বর্ণনা করেছেন–

অলীর মাঝে আমি যে বাজপাখী
উচ্চে সবার মোর ডানা
যে ধন আমায় দিয়েছে প্রভু

[৩২] বোখারী শরীফ, হাদিস নং-৬৫০২; মিশকাত শরীফ, হাদিস নং-২২৬৬।

পেয়েছে তা আর কোন জনা।[৩৩]

অর্থাৎ বেলায়তপ্রাপ্তগণের নেতৃস্থানীয় অলীকুলের তুলনায় আমি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উড়ন্ত বাজপাখি সদৃশ আমার তুল্য মর্যাদা মানবকুলে কোনো অলীকেই দান করা হয়নি। তিনি আরো বলেন–

করিল প্রভু, বাদশা মোরে
সকল অলী কুতুবদের;
তরীকা মোর রহিবে জারী
হোক না যত রকম ফের।[৩৪]

অর্থাৎ দুনিয়ার সকল অলী ও কুতুবগণের উপর তিনি আমাকে শাসক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁদের উপর আমার নির্দেশ সর্বদাই জারি ও কার্যকর থাকবে। তাই তাঁর কাছে "কুতুব রূপ" শক্তি বা ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। যে ক্ষমতায় তিনি কুতুবিয়াতের পদে পদবান। সে ক্ষমতার পদটি চিরদিন অক্ষত থাকবে। এই পদবী বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর পুর্বে প্রচলন ছিলো না। তখন এ পদের নাম ছিলো 'কুতুবুল আকতাব'। এই পদের ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করে হযরত গাউসুল আযম আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রহ.) তাঁর স্বীয় মাহাত্ম বর্ণনায় এরশাদ করেছেন, যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে তাকে আমি উম্মুক্ত সাহায্য করব। আমার সরকারের (শাসন ব্যবস্থা) এই প্রকৃতি হাশর তক চলতে থাকবে। এ সম্পর্কে হযরত শাহসূফী সৈয়দ নুরুল হুদা (রহ.) মাইজভাণ্ডারী বলেন, গাউসুল আযম কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম নয় (বরং) এটা আল্লাহ পাকের কুদরতের সৃষ্টি একটি নূরাণী শক্তির নাম। এ মহান নূরাণী শক্তি আল্লাহ পাকের তরফ হতে যে সময়ে যে মহান হাস্তীর জিম্মাদারিত্বে অর্পিত হয় তিনিই 'গাউসুল আযম' হিসাবে জগতে মশহুর হন।[৩৫]

হযরত রাসূল (দ.)-এর নিকট থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। প্রতি যুগে একজন রাসূল (দ.)-এর প্রতিনিধি বা খলিফা নিযুক্ত থাকবেন। তিনি জমীনের প্রধান আউলিয়া হিসাবে সাব্যস্ত হবেন। যিনি গাউসুল আযম তিনি কুতুবুল আকতাব, গাউসে জমান ও বটে।

---

[৩৩] আল-কালিমাতুল গাউছিয়া, কাসিদা-এ-নু'মান, গাউসুল আজম ও আলা হযরত (রা.) রিসার্স একাডেমী, প্রকাশকাল– মে ৩০, ২০০০ সাল, কসিদা নং-৮।

[৩৪] আল-কালিমাতুল গাউছিয়া, কাসিদা-এ-নু'মান, গাউসুল আজম ও আলা হযরত (রা.) রিসার্স একাডেমী, প্রকাশকাল– মে ৩০, ২০০০ সাল, কসিদা নং-১১।

[৩৫] অলী আল্লাহগণের স্তর বিন্যাস ও বেলায়তের রহস্য, লেখক: ডা: সৈয়দ মাওলানা এয়াকুব আলী (মা.), ২০১৪।

অধিকাংশ মোহাক্কেকীনদের মতে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.), হযরত মুর্শেদ আলী আল কাদরী আল মেদিনীপুরী (রহ.), হযরত সৈয়দ মাওলানা আহমদ উল্লাহ (রহ.) মাইজভাণ্ডারী (রহ.), হযরত সৈয়দ মাওলানা গোলামুর রহমান (রহ.) মাইজভাণ্ডারী (রহ.), হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রহ.) এরা সকলে এই শ্রেণির অলি আল্লাহ ছিলেন।

২. কুতুবুল আকতাবঃ এ পদে অধিষ্ঠিত এমন এক মর্যাদাবান অলি যিনি স্বীয় যুগে শুধু একজনই হবেন। তাঁর সমকক্ষ কেউ থাকবে না। তিনি যে যুগের সকল অলিগণের সর্দার হবেন। বিশ্ব জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য জগতের সব ক্ষেত্রে একই সময়ে তাঁর বিচরণ বিদ্যমান। যেমন রুহের বিচরণ সমস্ত শরীরে বিদ্যমান। তাঁর ফয়েজ অলি আল্লাহ তার প্রতিনিধি খলিফা হিসাবে ন্যাস্ত হন। কোনো সময়ে যদি এ মর্যাদাবান অলি অনুপস্থিত হয় তাহলে বিশ্ব জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। কাউকে বেলায়ত দান করা, কিংবা পদোন্নতি দান করা সব কিছু তিনিই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আধ্যাত্মিক জগতে তার বিভিন্ন নাম এবং উপাধি হয়ে থাকে যেমন কুতুবে আলম, কুতুবুল এরশাদ এবং আব্দুল্লাহ ইত্যাদি।

৩. গাউসঃ কোনো কোনো সূফীয়ায়ে কেরাম বলেন– "কুতুব ও গাউস একই মর্যদারই নাম।" কিন্তু হযরত মহীউদ্দিন আল আরাবী (রহ.)-এর মতে কুতুব ও গাউসের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে কোনো কোনো সময় কুতুব এবং গাউসের বৈশিষ্টাদি একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়ে থাকে। গাউস যারা হোন তারা সবাই গাউসুল আযমের অধীনে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

'গাউস' এমন কুতুবকে বলা হয় যার কাছে বৈধ কোনো জিনিস প্রার্থনা করা হয় এবং যার উছিলায় ফরিয়াদ কবুল করা হয়।

৪. আয়িম্মাহঃ এ পদে স্থলাভিষিক্ত প্রত্যেক যুগে শুধু দুজন হবেন। এরা দুজন উপরে বর্ণিত কুতুবের প্রতিনিধি এবং উজির হয়ে থাকেন। একজন কুতুবের ডান পাশের উজির তিনি যিনি অদৃশ্য জগতের কর্মকাণ্ড দেখাশুনা বা পরিচালনা করেন। তার নাম আব্দুল মুলক। অপরজন বাম পাশের উজির যিনি দৃশ্যমান জগতের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁর নাম আব্দুর রব। কোনো কুতুব ইন্তেকাল করলে অপরজন কুতুব নিয়োগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা কুতুবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৫. আউতাদঃ প্রত্যেক যুগে তারা শুধুমাত্র চারজন হবেন। তাদের দ্বারা আল্লাহতালা সারা জগতকে হেফাজত করেন। তাদের একজনকে পূর্ব প্রান্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁর নাম আব্দুল হাই। দ্বিতীয় জনকে পশ্চিম প্রান্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর নাম আব্দুল আলিম। তৃতীয় জনকে উত্তর প্রান্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর নাম আব্দুল মুরীদ এবং চতুর্থ জনকে দক্ষিণ প্রান্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর নাম আব্দুল কাদের। দৃশ্যমান জগত অর্থাৎ পৃথিবীকে যেভাবে পাহাড়কে পেরেকের (খুঁটির) মতো জমিনকে স্থির রেখেছে। অনুরূপভাবে এই আউতাদগনই বিশ্বজগতকে স্থির রাখেন।

৬. আবদালঃ প্রত্যেক যুগে এদের সংখ্যা ৭ হয়ে থাকে। তাদের মাধ্যমে আল্লাহতালা সপ্ত আসমান হেফাজত করেন। কোনো 'আবদাল' বিশেষ কারণে কোথাও গেলে নিম্ন পদের কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। যিনি আকৃতি ও প্রকৃতিতে হুবহু তার মতো হবেন। তাই প্রশাসনিক কাজে যেন কোনো পরিবর্তন না ঘটে, এ জন্য তাদেরকে আবদাল বলা হয়। আর যার কাছে এ ক্ষমতা নাই তিনি আবদাল হতে পারবেন না। এই সাত আবদাল সাতজন মহান নবীর পদাঙ্কের উপর বহাল থেকে এক এক আসমানের দায়িত্বে থাকেন। যেমন প্রথম জন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদাঙ্কের উপর চলেন এবং প্রথম আসমান পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন, তার নাম 'আব্দুল হাই'। এভাবে দ্বিতীয়জন হযরত মুসা (আ.)-এর পদাঙ্কে দ্বিতীয় আসমানের দায়িত্বে থাকেন, তাঁর নাম 'আব্দুল আলিম'। তৃতীয়জন হযরত হারুন (আ.)-এর পদাঙ্কের উপর তৃতীয় আসমানের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁর নাম 'আব্দুল মুরীদ'। চতুর্থজন হযরত ইদ্রিস (আ.)-এর পদাঙ্কের উপর চতুর্থ আসমানের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁর নাম 'আব্দুল কাদের।' পঞ্চমজন হযরত ইউসূফ (আ.)-এর পদাঙ্কের উপর পঞ্চম আসমানের দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁর নাম 'আব্দুল কাহের'। ষষ্ঠজন হযরত ঈসা (আ.) পদাঙ্কের উপর ষষ্ঠ আসমানের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁর নাম 'আব্দুস সামী' এবং সপ্তমজন হযরত আদম (আ.)-এর পদাঙ্কের উপর সপ্তম আসমানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁর নাম 'আব্দুল বসীর'।

৭. নোক্বাবাঃ এই পদবীধারী প্রত্যেক যুগে বারজন হয়ে থাকেন। উর্ধ্বজগতের বার রাশিচক্রের বার কক্ষপথ তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জনকে কক্ষপথের জ্ঞান ও দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে। মানুষের অন্তরের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা। শয়তান এবং তার গোপন

কর্মকাণ্ড সবকিছু তাদের কাছে উন্মুক্ত থাকে। এমন কি কোনো মানুষের চিহ্ন জমিনে দেখলে তারা বলেতে পারেন তা কোনো মানুষের এবং সে মানুষটি সৎ কি অসৎ।

৮. নোজাবা: এ পদের অধিষ্ঠিত অলীগণ প্রত্যেক যুগে আটজন হয়ে থাকেন। তাঁদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, চেহারা নূরান্বিত হয়ে যাবে তাঁদের চেহারা কাজকর্ম ইত্যাদি অবস্থা দ্বারা বোঝা যায় যে তাঁরা আল্লাহর মকবুল বান্দা। অনেক সময় তাঁরা স্বাভাবিকতার উর্ধ্বে থাকেন। আর যারা মর্যাদায় এদের চেয়ে উপরে কেবল তারাই এ অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। নিম্ন মর্যাদার অধিকারীগণ এ ব্যাপারে জ্ঞাত হতে পারেন না।

৯. আখইয়ার: উপরে বর্ণিত সাত আবদালের অধীনে আরো তিনশত পঞ্চাশ জন, অন্য বর্ণনায় চারশত চারজন 'আবদাল' থাকেন। তা হতে তিনশতজন হযরত আদম (আ.)-এর পদাঙ্কের উপর তথা তাঁর ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অন্যান্য আবদালগণ অন্যান্য নবীর ফয়েজের উপর বহাল থাকেন। এ আবদালগণ থেকে আল্লাতালা চল্লিশজনকে পৃথকভাবে নির্বাচন করে বিশেষ পদ মর্যাদায় ভূষিত করেন। এ চল্লিশজনই হলেন 'আখইয়ার'।

১০. আমাদ: এ পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিতজনের সংখ্যা হলো চার। তাঁদের নাম আধ্যাত্মিক জগতে 'মুহাম্মদ'। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

১১. মাকতুবান: এ পদ মর্যাদায় নির্বাচিতগণের সংখ্যা চার হাজার। এরা একজন অপরজনকে চিনেন, জানেন এবং একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, কিন্তু আল্লাহতালা তাঁদেরকে যে এতো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, সে খবর তাঁদের কাছে গোপন থাকে ফলে নিজেরাই নিজেদেরকে চিনতে পারেন না। তাঁরা সর্বদা অপ্রকাশ্য থাকেন।

১২. আবরার: বিশ্বের সকল বেলায়েত প্রাপ্ত আউলিয়া কেরামরা এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। মূলতঃ এখান থেকেই যোগ্যতা ও কামালিয়াতের ভিত্তিতে উপরোক্ত মর্যাদায় ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি হয়ে থাকে। অর্থাৎ এরা হলেন আল্লাহতালার ক্যাডার সার্ভিসের সম্মানিত সদস্য। পবিত্র কোরআনের ভাষায় এরা হলেন 'সালেহীন'।

আল্লাহপাক বিশ্ব পরিচালনা করার জন্য ফেরেস্তাদেরকে যেমন বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব দান করেছেন অনুরূপভাবে সৃষ্টি জগতের প্রশাসনিক কাজ

সম্পাদন করার জন্য এই সব আউলিয়া কেরামগণকে বিশেষ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দান করেছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কর্মপদ্ধতির অর্থাৎ মানুষের হায়াত, মৃত্যু, রিজিক, ধন-দৌলত, যাবতীয় ভালো-মন্দ সব কিছুর একমাত্র অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি তাঁর মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে এ সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। যেমন কুরআন শরিফে উল্লেখ আছে–

১) "ওহে মরিয়ম আমি তোমারই প্রতিপালকের বার্তাবাহক। তোমাকে পুত্র সন্তান দান করতে এসেছি।" [সূরা ১৯ মরিয়ম, আয়াত-১৯] এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) সন্তান দান করেন।

২) আমি ঈসা (আ.) মাটির তৈয়ারী পাখিতে ফুঁক দিলে আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যায়। এ আয়াত পাকে জানা যায় যে হযরত ঈসা (আ.) নিষ্পানকে প্রাণ দান করেন। [সূরা ০৩ আল ইমরান]

৩) বলে দিন, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে, যাকে তোমাদের এ কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে। [সূরা ৩২ সেজদা]

৪) আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে ধনী করেছেন। "আগনাকুমুল্লাহ রাসূলুহু মিন ফাদিল" অর্থাৎ আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন।

মিশকাত শরীফের কিতাবুল ইলমের মধ্যে আছে রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন– "আমি বন্টনকারী আর মালিক।" এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (দ.) নিঃস্ব-দরিদ্র-নিপীড়িত লোকদেরকে ঐশ্বর্যশালী করেন। রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত রাবিয়া ইবনে ক্বাব (রা.) নবী করীম (দ.)-এর কাছে জান্নাত লাভের প্রার্থনা করে বলেন– "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। রাসূল (দ.) হযরত জাবের (রা.) এর গৃহে খানাপিনা শেষ করে ছাগলের উচ্ছিষ্ট হাড্ডি দ্বারা পুনরায় ছাগল জীবিত করেন এবং হযরত জাবের (রা.)-এর মৃত সন্তানদ্বয়কে প্রাণ দান করেন। মসজিদে নববী শরীফের মৃত শুকনো খুঁটির (উস্তুনে হান্নানা) মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। এ সকল হাদীছের আলোকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে নবী (দ.) কুল কায়েনাতের মুখতার ও সুলতান তথা প্রশাসক। তিনি হারাম-হালালের সমাধান দাতা, মুক্তি দাতা, কল্যাণ দাতা, তাঁর ইখতিয়ারই খোদার ইখতিয়ার তাঁর সন্তুষ্টিই খোদার সন্তুষ্টি। আর হযরতে আউলিয়ায়ে কেরাম মাশাইখগণ হচ্ছেন নবী করীম (দ.)-এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডে নবী করীম (দ.)-এর মোজেজার বহিঃপ্রকাশ কারামাত হিসাবে সংঘটিত হয়। তাই আওলাদে রাসূল (দ.) ওলীকুল সম্রাট হযরত গাউসুল আযম আব্দুল কাদের

জিলানী (রহ.) বলেছেন– "আমার বেলায়েতের দৃষ্টি দ্বারা আল্লাহর হুকুমে মৃত লোক জীাবিত হয়ে যায়।" উপরোল্লিখিত আয়াতে করীমা এবং হাদীস ও আউলিয়াদের বহু বাণীর আরো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেখানে আল্লাহর কার্যাবলীকে বান্দাদের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহর এ বিশাল রাজ্যের প্রশাসক আল্লাহ তাঁদের দেন, তারা আমাদেরকে দান করেন। আল্লাহতালা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত দায়িত্বসমূহ বন্টন নবী, অলীদেরকে বিশেষ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রদান করার কারণ এ নয় যে, মহান প্রতিপালক আল্লাহতালা বান্দাদের মুখাপেক্ষী; বরং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের শান ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যা তিনি আদম সৃষ্টির পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন– "আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা সৃষ্টি করব।" প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতির অনুসরণ ও বাস্তবায়নের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং অবশ্যই তিনি ওয়াদা ভংগকারী নন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মোটেই বেখবর নন; বরং তাঁর নিয়োজিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির সকল প্রকার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিয়ে থাকেন।

> উম্মুল মুমেনীন হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) বলেন– "আমি রাসূল (দ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আমাদের মাঝে সৎ লোকদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূল (দ.) বলেলন– হ্যাঁ, যখন দুষ্কর্ম অধিক হয়ে যাবে।"[৩৬]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মানুষের মধ্যে যখন দুষ্কর্ম প্রবল হয়ে যায় তখন সামান্য কিছু সংখ্যক লোকের সৎকর্ম এবং এদের অস্তিত্ব আল্লাহর সেই ধ্বংসকে প্রতিহত করতে পারেনা। দুষ্কর্ম অর্থাৎ অন্যায়-অনাচার-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে মদ্যপান, ঘুষ, সুদ, ওজন ও পরিমাপে কম দেওয়া বা খাদ্যে ভেজাল, মাতা-পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন, প্রতারণা, বঞ্চনা, অবিশ্বাস, সন্দেহ ইত্যাদি সমাজে প্রবল হয়ে যায়, সৎ মানুষ কমই থেকে যায়, তখন খোদায়ী গজব ধ্বংস ও বিনাশ নেমে আসবে। তখন সেই ধ্বংসে সৎ মানুষগুলো বেঁচে থাকবে আর পাপী তাপীরাই বিনাশ হয়ে যাবে তা নয়; বরং সবার ওপর সমানভাবে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। এ বিষয়টি অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

---

[৩৬] বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭০৫৯; তিরমিজি শরীফ, হাদীস নং-২১৮৭; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৯৫৩।

"যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির ওপর আযাব নাযিল করেন, তখন তাদের সবাইকে ধ্বংস হতে হয়, যারা তাদের মাঝে থাকে। তারপর নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী সবার হাশর হবে।"[৩৭]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, পাপ ও নাফরমানীসমূহের অধিক্য ব্যাপক আযাব আগমনের বিশেষ কারণ। অতএব আযাব যে সে আযাব নয়; বরং এমন সর্বগ্রাসী আযাব যা অসৎ-সৎকে সমভাবে ধ্বংস করে দেয়।

[৩৭] মিশকাত শরীফ, ভয় ও ক্রন্দন অধ্যায়, হাদীস নং-৫৩৪৪; বুখারী শরিফ, হাদীস নং-৭১০৮; মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৮৭৯।

সামাজিক অত্যাচার ও কার্পণ্যের কুফল

হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূল (দ.) বলেছেন– "আল্লাহ তায়ালা জালিমদের অবকাশ দিতে থাকেন, কিন্তু যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। তারপর কুরআনের এই বাণী পাঠ করেন–

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"তোমার পালনকর্তার পাকড়াও এমনই কঠিন যে, যখন তিনি অত্যাচারে লিপ্ত জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন, তখন অবশ্যই তাঁর পাকড়াও হয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কঠোর।" [সূরা ১১ হুদ, আয়াত-১০২]

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন– "তোমরা অত্যাচার থেকে বেঁচে থাক। কারণ অত্যাচার কেয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে উপস্থিত হবে, আর তোমরা কার্পণ্য থেকেও বাঁচ। কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। তাদেরকে অন্যায় ভাবে রক্তপাত ঘটাতে প্ররোচিত করেছে এবং হারাম সমগ্রীকে তারা কার্যত হালাল বানিয়ে নিয়েছে।"[৩৮]

এ হাদীসে জুলুম বা অত্যাচার ও কৃপণতা পরিহার করার তাগিদ দেয়া হয়েছে, এ দুটি বিষয় জাতি, দল পরিবারকে ধ্বংসাত্মক বিপদাপদের কবলে নিপতিত করে বিনাশ করে ছাড়ে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী সকল মানবীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করাই জুলুম আর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় না করাই হলো কার্পণ্য ও কাঞ্জুসী। অর্থ প্রীতি ও সম্পদ লিপ্সায় আজ অন্তর আচ্ছন্ন। ফলে হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করা হয়না, পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য মন উদ্বুদ্ধ হয়না। অন্যের অধিকার গ্রাস করার পন্থা ও ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়। এর মূল কারণ পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ
وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا

"না কখনও না; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করনা, এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ রূপে ভক্ষণ করে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালোবাস।" [সূরা ৮৯ ফজর, আয়াত-১৭-২০]

---

[৩৮] মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৫৭৮; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-১৮৬৫।

সমাজে আমরা এর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। বর্তমানে আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারের সম্পত্তি আল্লাহর দেয়া উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ভাই বোন ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে দেয়া হয়না। ফলে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধী হয়। এর পরিণতিতে বড় বড় পাপাচারের আশ্রয় নেয়া হয় যার বিপদ মানুষকে ভোগ করতে হয়। বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, অত্যাচারীকে যথাশীঘ্র পাকড়াও করা না হলেও অত্যাচারী নিজে তার পরিবার-পরিজন ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী যেন এ ধারণা পোষণ করে যে, অন্যের বৈধ পাওনা হরণ করে সে বা তার পরিবার যে ধরণের অবৈধ সুযোগ ও সম্পদ ভোগ করছে তার জন্য তাদেরকে কখনও পাকড়াও করা হবেনা। কিংবা সে বা তারা অনায়াসে নিরুপদ্রবভাবে জীবন অতিবাহিত করতেই থাকবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর এই আপাত শিথিলতা দেখে কোনো অত্যাচারী যেন প্রবঞ্চিত না হয়। আকস্মিকভাবে যখন তাকে পাকড়াও করা হবে তখন তা হবে অত্যন্ত কঠিন।

ইতিহাসের পাতা থেকে দেখা যায়, যখনই কোনো সরকার কিংবা জাতি-সম্পদায় অথবা কোনো ব্যক্তি অত্যাচারের পথ অবলম্বন করেছে তখন তার পরিণতি মন্দই হয়েছে। এক হাদীসে রাসূল (দ.) বলেন–

> "যে লোক কোনো অত্যাচারীর সঙ্গে চলে (সহায়তা করে) তাকে শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্য। অথচ সে জানে লোকটি অত্যাচারী, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যায়।"[৩৯]

যখন রাসূল (দ.)-এর বিবেচনায় অত্যাচারীর সহযোগী সম্পর্কে বলা হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকেনা। অর্থাৎ কার্যত সে ধর্ম প্রত্যাখানকারীতে পরিণত হয়। তাহলে মূল অত্যাচারীর অবস্থান আল্লাহর দৃষ্টিতে কোথায় যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, অত্যাচারী শাসকবর্গ জমিদার ও বিত্তবানদের কর্মচারী, পারিষদ, নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য কর্মচারী যারা অত্যাচারীর সাহায্য করে তাদের সবারই এই হাদীসটির নির্দেশ অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত।

[৩৯] মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-৫১৩৫; বায়হাকী শরীফ, হাদীস নং-৭৬৭৫।

দুনিয়াপ্রীতি ঈমানকে দুর্বল করে দেয়া সম্পর্কে হাদীসঃ

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে–

> রাসূল (দ.) বললেন– "এমন এক যুগ আসবে যখন কাফের ও বাতিল পন্থীদের দলবল মিলে মিশে তোমাদেরকে বিনাশ করার জন্য এমনভাবে সমবেত হবে, যেমন বুভুক্ষের দল সম্মিলত হয় খাবার পাতের আশে পাশে। (এ কথা শুনে) এক সাহাবী নিবেদন করলেন, তাহলে কি সেদিন আমরা সংখায় কম থাকব? রাসূল (দ.) বললেন না; বরং তোমরা সংখায় অনেক থাকবে, কিন্তু সে সমস্ত খরকুটোর মতো থাকবে। যেগুলিকে পানি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে সময় তোমাদের অন্তরে দুর্বলতার কারণ কি হবে? রাসূল বললেন, তোমাদের মধ্যে দুনিয়া প্রীতি প্রবল হবে এবং মৃত্যুকে ভয় করবে।"[৪০]

দুনিয়াপ্রীতি বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমরা আল কুরআন থেকেই উদ্ধৃত করছি–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ

১. **নারী-যৌন আকর্ষণ, সন্তানাদি, রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এই সব দুনিয়ার ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে উত্তম আশ্রয়স্থল।** [সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-১৪]

وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

২. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার কাছে আসতে কোনো সাহায্য করবেনা, তবে কাছে আসবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আর তারা তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার।

[সূরা ৩৪ সাবা, আয়াত-৩৭]

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ

[৪০] আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪২৯৭; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-৫৩৬৯।

৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরা ৬৩ মুনাফিকুন, আয়াত-০৯]

ঐতিহাসিকভাবে রাসূল (দ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মুসলমানরা নিজেদের দুরবস্থা, তাদেরকে পৃথিবীর কোথায়ও সম্মানের চোখে দেখানো হয়না। পৃথিবীতে বিধর্মীরা তাদের অস্তিত্বই সহ্য করতে পারছেনা। অথচ এমনও এক সময় ছিলো যখন অন্যান্য জাতি সম্প্রদায় মুসলমানদের শাসক হিসাবে পেতে আনন্দবোধ করত। পরে এমন যুগ এলো যখন কোনো জাতি মুসলমানদের আর শাসক হিসাবে দেখতে পছন্দ করলো না এমনকি অধীন জাতি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও। তবে এমন ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে যে স্বয়ং মুসলমানরা সেখানে শাসক হিসাবে রাজত্ব করত। কিন্তু বিপ্লবের পর তারা সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনি। এমন কি বর্তমানে সে দেশে মুসলমান খুঁজে পাওয়ায় দুষ্কর হয়ে গেছে। এর জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হলো বর্তমান স্পেন।

কেন আজ মুসলমানদের এমন অপমান ও নিগ্রহের মুখ দেখতে হচ্ছে? সংখ্যায় কোটি কোটি হওয়া সত্ত্বেও কেন তাদেরকে পাশ্চাত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে? এর উত্তর স্বয়ং বিশ্ব দিশারী রাসূল (দ.)-এর ভাষ্যেই বিদ্যমান রয়েছে তাহলো এই যে, "দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যু ভীতির কারণেই এ অবস্থা।"

১৯৯১ সালে ও **২০০৩** সালে আমেরিকা ও তার মিত্র বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বাগদাদে আক্রমনের ঘটনা যারা টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করেছেন তারাই বলবেন রাসূল (দ.) এই মহান বাণী আক্ষরিক অর্থেই (অর্থাৎ সবাইকে বাগদাদ আক্রমনের জন্য প্ররোচিত করার ঘটনা) মুসলমানরা যে সময় দুনিয়াকে প্রিয় জ্ঞান করতনা এবং জান্নাতের তুলনায় (যা শহিদী মৃত্যু ছাড়া পাওয়া যায়না) পার্থিব জীবন তাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ছিলো তখন সংখ্যায় অল্প থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের ওপর তারা প্রবল ছিলো এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করে অন্যদের অন্তরে পর্যন্ত রাজত্ব করত।

আমাদের আজকের যে অবস্থা, তাকে আমরা নিজেরাই পাল্টাতে পারি, তবে শর্ত হলো পূর্ববর্তী মুসলমানদের মতো দুনিয়াকে নিকৃষ্ট এবং মৃত্যুকে প্রাণাধিক প্রিয় মনে করতে হবে। অন্যথায় অপমান শুধু বাড়তেই থাকবে। এতএব হে বুদ্ধিমান শিক্ষা গ্রহণ কর। আল্লাহ আজও পর্যন্ত সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেননি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যাদের মধ্যে নেই।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল (দ.)-এরশাদ করেছেন–

"যখন গনীমত (জনগণের সম্পদ) সামগ্রীকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে। আমানত খিয়ানত করা হবে, আমানত সামগ্রীকে আত্মসাৎ করা হবে। জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, দুনিয়া উপার্জনের জন্য দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা হবে। যখন মানুষ নিজের স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মাকে নিপীড়ন করবে। বন্ধুদেরকে কাছে টেনে নেবে আর পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে শোর গোল শুরু হবে, সম্প্রদায় (গোষ্ঠী) এর নেতা হবে অসৎ লোক। জাতির দায়িত্বশীল হয়ে বসবে বেজাত লোক, কোনো লোকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান করা হবে। গানবাদ্য করবে রমনী (তথা সিনেমা, নাটকের নায়িকা বা বিজ্ঞাপনের মডেল) ও গানবাজের নানা ধরনের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি ঘটবে। মদ্যপান ব্যাপক হবে এবং এ উম্মতের উত্তরসূরীরা সৎ পূর্বসূরীদের অভিসম্পাত করতে থাকবে। তখন লোহিত রং ঘুর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পের অপেক্ষায় থাকো, ভূমিতে ধ্বসে যাবার (Land Slide) আকৃতি-বিকৃত (মহিলা পুরুষের বা পুরুষ মহিলা হয়ে যাবে) এবং আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণেরও অপেক্ষা করো। এ সব আযাবের সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত লক্ষণেরও অপেক্ষা করতে থাকো। যা ক্রমাগত (একের পর এক) এমনভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে যেমন মালার সূতা ছিড়ে গেলে হয়। দানাগুলো একের পর এক পড়ে যেতে থাকে।"[৪১]

হযরত আলী (কা.) থেকেও এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং তাতে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে– "পুরুষরা রেশমী কাপড় পড়তে শুরু করবে।"[৪২]

মুনাজাত গজবে পরিণত হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আল্লাহ দাউদ (আ.)-এর প্রতি অহী নাযিল করিয়া বলিলেন–

"অত্যাচারীদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন আমার জিকির না করে কারণ যে ব্যক্তি আমার যিকির করে, আমিও তাহার জিকির করি। আমার অত্যাচারীদিগকে স্মরণ করার অর্থ হইল তাহাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করা।"[৪৩]

পবিত্র কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত মানব জাতির দুষ্কর্মের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা হলো–

---

[৪১] বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৬৪৯৬; মিশকাত শরীফ, হাদিস নং-৫৪৩৯।

[৪২] তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২২১০; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং-৫৪৫১।

[৪৩] হাকেম ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সংকলন: আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী, অনুবাদ: মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ, প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পৃ. ৭১-৭২ হাদীস।

قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

"বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করতে; তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে; এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষ আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম; দেখ আমি কিরূপে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

[সূরা ০৬ আনআম, আয়াত-৬৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ওপর থেকে যে শাস্তি আসতে পারে তা অনবরত বৃষ্টি ও বন্যার আকারে হতে পারে। যেমন নূহ (আ.) সময়কার লোকদের ওপর ঘটেছিল অথবা প্রচণ্ড বিদ্যুৎপাত হয়ে অগ্নিবর্ষণ হওয়ার মতো ব্যাপার নেমে আসতে পারে। আবার এ শাস্তি সালেহ (আ.) নবীর অনুসারীদের ওপর যেভাবে ভয়ঙ্কর নিনাদ আকারে অবতীর্ণ হতে পারে। নীচের দিক থেকে যে শাস্তি, তা কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ভূমিকম্প অথবা পায়ের নীচ থেকে মাটি ধ্বসে যাওয়াকে (ভূমিধ্বস বা (Landslide) বোঝায়। যেমনকরে মাটি সরে গিয়েছিল কারুনের (মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক) পায়ের নীচ থেকে। আবার নীচের শাস্তি দ্বারা কোনো অনাবৃষ্টি এবং তার ফলে তরুলতার জীবননাশ হয়ে যাওয়াকেও বোঝায়। এই বিষয়টির অন্য একটি ব্যাখ্যা রয়েছে যা ইবনে আব্বাস (রা.) মনে করেন। তাঁর মতে ওপর হতে শাস্তি বলতে শাসক শ্রেণি ও তাদের আমীর-উমরাদের অত্যাচারকে বোঝানো হয়েছে আর নীচের থেকে শাস্তি দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের গোলযোগ, অত্যাচারকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে দিতে পারেন বলে যে উক্তি রয়েছে তার অর্থ কোনো দলের সামাজিক ঐক্য ও রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বিধা বিভক্তিকে বুঝিয়ে থাকে। যার ফলে তারা আর এক জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকে না; বরং অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী বিবাদমান ব্যক্তির সমষ্টিতে পরিণত হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে ৭৩ ফিরকা এই শাস্তির মধ্যেই নিহিত আছে। আবার রাজনৈতিকভাবে একাধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে চূড়ান্ত অনৈক্য বা মতবিরোধিতা। যা কখনও কখনও সমাজে বিপ্লব বা গৃহ যুদ্ধও ঘটিয়ে থাকে। এ ছাড়াও রয়েছে বিধর্মী বা ভিন্ন মতাদর্শ সম্বলিত বৈদেশিক আক্রমন। যেমন পাশ্চাত্য দেশসমূহ সমগ্র মুসলিম দেশসমূহকে যেভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের পদানত করেছিল যে ধারা কূটনীতির মাধ্যমে অদ্যাবধি অব্যহত রয়েছে।

কুরআনের ভাষায় বিভিন্ন জাতি ও মানুষের অপকর্মের জন্য এটিই হলো খোদায়ী গজব তথা আসমানী বা ঐশী শাস্তি। যদি তারা সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠ ও সদাচারী হতে পারত এবং অন্যান্যের মতামত ও কল্যাণের প্রতি যদি তারা শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারত তবে অনৈক্য সৃষ্টিকারী যে সমস্ত দৈব দুর্বিপাক তারা ভোগ করছে তা তাদেরকে ভোগ করতে হতোনা কিন্তু সততা, ন্যায় বিচার, সদাচার ইত্যাদি চেয়ে পাওয়া যায় না; বরং নির্দিষ্ট বিশ্বাসে, আত্মত্যাগের নীতিবোধ এবং নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতি আনুগত্য ও মান্যতা দ্বারা সৃষ্ট সংকল্প ও দৃঢ়তা এসব হতেই উল্লিখিত গুনাবলীর সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অতএব চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মানুষের আকাঙ্খিত ঘটনাবলী এমনকি প্রাকৃতিক দূর্যোগ পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এ পর্যায়ে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে খোদায়ী গজব সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা প্রদানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো বিজ্ঞানের কাজ হলো প্রকৃতিকে জানা। সুতরাং প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা তথা অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ও প্রতিকার সর্বদাই অনুসন্ধান চালায় এবং সত্য উদঘাটনে তৎপর হয়ে ঝড়, বন্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মানুষকে পূর্বাভাস দেয়। বিজ্ঞান এ গুলোর কারণও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আংশিকভাবে। তবে বিজ্ঞান অধিকাংশ দুর্যোগকে ঠেকাতে পারেনা। এমনকি কোনো কোনো দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্পের কারণও অনুসন্ধান করতে তা সক্ষম হয়নি। এ কারণে অনেকে বিজ্ঞানকে দোষ দেয়। কারণ অসহায়, অক্ষম, অজ্ঞ মানুষ বিজ্ঞানের কাছে বেশি কিছু দাবি করে এবং জোরেশোরে প্রচারও করে যে বিজ্ঞানই সকল কিছু একদিন করায় ও করবে। ফলে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির বিপর্যয় সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়ে মানব জাতিকে রক্ষা করবে। এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ বিশ্লেষণ করলে 'বিজ্ঞান' শব্দের ব্যাখ্যা জনিত ত্রুটি এবং প্রয়োগ, ব্যাপ্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা বা জ্ঞানের অভাব। তাই আমরা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

অভিধান অনুযায়ী 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান, ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক ও বিশেষ জ্ঞান, পরীক্ষা, প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা নিরুপিত শৃংখলাবদ্ধ জ্ঞান। যদি কেহ প্রশ্ন করে কোনো বিশেষ জ্ঞান থাকলে তাকে বৈজ্ঞানিক বলা হবে এর কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া কারো পক্ষেই সাধারণবুদ্ধি অনুযায়ী সম্ভব নয়। কারণ সকল শিক্ষিত মানুষই জানেন যে, যে কোনো বিদ্যাই বিশেষ। তাই একজন যতবড় চিকিৎসা বিজ্ঞানীই হোন না কেন তিনি আইনবিদ্যার কিছুই বোঝেন না।

এখন আমরা 'বিদ্যা' বলতে কি বোঝায় তা জানার চেষ্টা করব। 'বিদ্যা' বলতে বোঝায় অধ্যয়ন জনিত জ্ঞান। পাণ্ডিত্য, তত্ত্বজ্ঞান, দক্ষতা, শাস্ত্র, শিক্ষনীয় বিষয় ইত্যাদি। তাহলে বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? অর্থাৎ যিনি বিদ্বান, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই বিজ্ঞানী। তাহলে বিজ্ঞানীদের কোনো আলাদা মর্যাদা থাকার কথা নয়। কারণ এদের সবাই (বিদ্বান, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী) কোনো না কোনো বিষয়ে পারদর্শী বা জ্ঞানী। এই বিষয় বিবেচনা

করে বিশ্বে বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্তির সনদ হিসাবে আন্তর্জাতিক মানের সনদের বিষয়টি এসে যায়। সেটি হলো PHD বা Doctor of Philosophy ইংরেজীতে Doctor শব্দের যে অর্থটি এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলো a person who has received the highest of University Degree. অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তি তাদের জন্য নির্বাচিত পরীক্ষায় পরীক্ষকদের বিবেচনায় নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারলেই তিনি জ্ঞানানুরাগী হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। আর philosophy শব্দটি Latin যার আভিধানিক ইংরেজী অর্থ হলো the study of the nature and Meaning of the universe and of human life. হলো philosophy শব্দের ব্যাখ্যা। প্রকৃত অর্থ হলো Love of wisdom. অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগী।

এবার আমরা দেখি 'জ্ঞান' বলতে কি বুঝায়। 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ হিসাবে অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, বোধ, বুদ্ধি, অনুভব শক্তি, সংজ্ঞা, চেতনা বুঝিবার বা বিচার করিবার ক্ষমতা, বিবেচনা, অবগতি, পাণ্ডিত্য, শিক্ষা, বিদ্যাবত্তা (শাস্ত্রজ্ঞান) অভিজ্ঞতা, পরম তত্ত্ব (জ্ঞান চক্ষু, জ্ঞান যোগ)

এসব অর্থের মধ্যে শুধু 'জ্ঞান চক্ষু' বা 'জ্ঞান যোগ' বিষয়টি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে আমরা পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসের ১০১ নম্বর আয়াত পর্যালোচনা করব। এরশাদ হচ্ছে–

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلآيَاتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ

"বল, হে রাসূল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসেনা।" [সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-১০১]

এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহতালা বিশ্বের মানবকে তাঁর সৃষ্টির বুকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এসব কিছুই কোরআনের ভাষায় 'আয়াত' তথা নিদর্শন। তোমরা ইহা হইতেও অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পার। সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে চিন্তা ও গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গবেষণা কর। উহা হইতে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা পর পর সাজাইয়া উহার সিদ্ধান্ত করতে চেষ্টা কর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তালাশ কর এই বাহ্য জগতের অন্তরালে যে মহাসত্যের অবস্থিতির খবর ইহারা দিতেছে, তাহা প্রমাণকারী কোনো নিদর্শন তোমরা দেখিতে পাও কি না। যদি তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় এবং ইহার ইশারাও হয় স্পষ্ট, অকাট্য তাহলে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত নির্দেশনাসমূহ মেনে চলো।

এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহতালা সবচেয়ে সহজ ও অকাট্য দৃশ্যমান বস্তু হিসাবে চন্দ্র-সূর্য বা দিবারাত্রির সৃষ্টি ও রহস্য সম্পর্কে একটি সূরায় বর্ণনা করেছেন–

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

إِنَّ فِى ٱخْتِلاَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

أُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

"তিনিই (আল্লাহ) সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন ঔজ্জ্বল্য এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব স্তর (মানজিল) ঠিক ঠিকভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে তোমরা উহারই সাহায্যে বৎসর ও তারিখসমূহের হিসাব জানিয়া লও। আল্লাহতালা এসব কিছু খেলার ছলে নহে; বরং স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহার নিদর্শনসমূহ একটি একটি সুস্পষ্টরূপে পেশ করিতেছেন, তাহাদের জন্য যাহারা জ্ঞানবান। নিশ্চিতই রাত-দিনের আবর্তনে আর আসমান জমীনে আল্লাহতালা যত জিনিসই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি জিনিসে নিদর্শনসমূহ রয়েছে, সেই লোকদের জন্য, যাহারা ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল আচরণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহে। নিশ্চয়ই যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল। তাহাদের আবাস অগ্নি, উহাদের কৃতকর্মের জন্য।" [সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-৫-৮]

সৃষ্টিলোকের সর্বত্র খোদার যে ক্রিয়াশীলতা প্রতি মূহুর্তে পরিলক্ষিত হয় তাহার সবচেয়ে বড় চিহ্ন হইতেছে এই সূর্য ও চন্দ্র এবং রাত্র ও দিনের আবর্তন। ইহা প্রত্যেকটি ব্যক্তির সম্মুখে প্রতিভাত রয়েছে। যা দেখে স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই বিরাট সৃষ্টিলোকের সৃষ্টিকর্তা কোনো শিশু বালক নন। এই সৃষ্টিকর্ম নিছক কোনো ছেলে খেলাও নয়। এটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এর প্রতিটি কাজে গভীর শৃংখলা রয়েছে, আছে যুক্তিবিজ্ঞান, আছে কল্যাণের ভাবধারা। প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির ব্যাপারে গভীর উদ্দেশ্যবাদের স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

অতএব তিনি যখন বিজ্ঞানী যুক্তিবাদী এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের সম্মুখে বিরাজমান রেখেছেন, এখন তিনি মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক নৈতিক চেতনা, স্বাধীন দায়িত্ব ও প্রয়োগ ক্ষমতা দানের পর তাহার জীবনের কার্যাবলীর কখনো হিসাব লওয়া হবেনা এবং বিবেক ও নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার লাভের যে অধিকার অনিবার্য হয়ে থাকে, তাকে নিষ্ফল ও অর্থহীন করে দেবেন, এইরূপ ধারণা মানুষ কেমন করে করতে পারে? প্রকৃত পক্ষে কোরআনে বর্ণিত এইরূপ জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐশী বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান বিবেচনা করে বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞান' ও 'বিদ্যা' শব্দ দুটি তৈরী করা হয়েছে।

'বিজ্ঞান' অর্থ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক প্রকৃতিতে বিজ্ঞাপিত (প্রদর্শিত) বস্তু এবং এ সম্পর্কে সার্বিক ও নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিই হচ্ছেন 'বৈজ্ঞানিক' বা 'বিজ্ঞানী'। আর বিদ্যমান (প্রকৃতিতে বিদ্যমান বস্তু-সামগ্রী) সম্পর্কে যার সঠিক, প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞান রয়েছে তিনিই 'বিদ্বান'। আমাদের দুর্ভাগ্য ঐশীজ্ঞান বিবর্জিত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই আমরা এই দুইটি উপাধি দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছি আর আমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছি এবং অন্য সকলকে চিরস্থায়ী বিভ্রান্তির দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছি। আর তাদের কাছ থেকে এমন কিছু আশা করছি যে সম্পর্কে তাদের দূরতম কোনো ধারণাই নাই।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তাহলো– "আল্লাহ তাহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ও প্রকাশিত করিয়া পেশ করিতেছেন জ্ঞানী ও অবগতি সম্পন্ন লোকদের জন্য এবং বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেকটি জিনিসেই নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান তাহাদের জন্য। (বিশেষ করে) তাহাদের জন্য যাহারা ভুলনীতি ও ভুল আচরণ হইতে বাঁচিতে চাহে।" এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত বিজ্ঞানমূলক তথা বিজ্ঞজনোচিত নীতিতে জীবনের প্রকাশনায় সর্বত্র এমন সব নিদর্শণ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, যাহা উহার অন্তরালে রক্ষিত মহা সত্যকে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই সব চিহ্ন ও নিদর্শন হইতে অন্তর্নিহিত মহাসত্য লাভ করা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের মধ্যে দুটি গুণ বা বৈশিষ্ট রয়েছে। প্রথমটি এই যে তারা মূর্খতামূলক হিংসাদ্বেষ বা বিদ্বেষী মনোভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নির্ভুল জ্ঞান ও অবগতি লাভের জন্য খোদার দেওয়া যাবতীয় উপায়-উপাদান প্রয়োগ করবে। আর দ্বিতীয়টি এই

যে, ভুল-ভ্রান্তি, আন্দাজ-অনুমান হতে বেঁচে থেকে নির্ভুল ও সঠিক পথ অবলম্বনের এক উগ্র কামনা-বাসনা তাদের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকবে।

পার্থিব দৃশ্যমান জগতে এ ধরণের বাস্তব নিদর্শন বা প্রমাণ থাকা সত্তেও স্রষ্টা সম্পর্কে একশ্রেণির দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনো ঐশী ধারণার বিষয় বিবেচনা না করে কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য/বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত অবলীলাক্রমে প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

"প্রকৃত কথা এই যে, তাহাদের অনেক লোকই শুধুমাত্র ধারণা-অনুমান প্রকৃত সত্য জ্ঞান লাভের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পুরা করিতে পারেনা। ইহারা যাহা কিছু করিতেছে, আল্লাহ তাহা খুব ভালভাবেই জানেন।"

[সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-৩৬]

এই ধরনের আজগুবি ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বহু তত্ত্ব, তথ্য ও মতবাদ বিজ্ঞানের নামে দর্শনের নামে 'অর্থনীতির' নামে 'সমাজ বিজ্ঞানের' নামে 'মনোবিজ্ঞানের' নামে সমাজে প্রচলিত আছে, যা প্রকৃতপক্ষে অর্ধ সত্য। আর অর্ধসত্য কথা প্রকৃত মিথ্যার চেয়েও জঘন্য। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী (পদার্থবিদ) ড. ষ্টিফেন হকিং এর পৃথিবী সৃষ্টি ও ঈশ্বর বা আল্লাহ সম্পর্কে তার মতবাদ। তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক A Brief History of Time ১৯৮৮ সালে Best seller বা সর্বাধিক বিক্রিত পুস্তকের মর্যাদা অর্জন করেছিল। এই বইটিতে আল্লাহ, ঈশ্বর তথা বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে তার অনুমান ভিত্তিক অনেক কথা বলেছেন যা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের অধিক্ষেত্রের বাইরে এবং ডাহা মিথ্যাও বটে। হকিং এর এই ভূমিকাতে কার্ল সাগা, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, লিখেছেন– "এটা ঈশ্বর সম্পর্কেও একটি বই অথবা ঈশ্বরের না থাকার সম্পর্কেও। ঈশ্বর শব্দটি এই বইয়ের পাতায় পূর্ণ। বিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোনো পছন্দ ছিলো কিনা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই বিখ্যাত প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য হকিং প্রচেষ্টা নেন। হকিং স্পষ্ট করে বলেছেন। এই পর্যন্ত তিনি যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তার ফলাফল অপ্রত্যাশিত। হকিং চেয়েছেন এমন এক বিশ্ব যার নেই কোনো কিনারা মহাশূণ্যে, কোনো শুরু নেই। কোনো শেষ নেই এবং স্রষ্টার করার কিছু নেই। হকিং এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তাতে ঈশ্বরের যে পরিচয় ফুটে উঠে বিশ্ব সৃষ্টিতে সেই ঈশ্বরের যেন কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহ

ছিলনা এমনকি তার করারও কিছু ছিলনা"। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় একান্ত, এরকম, সুবিন্যাস্ত, সুশৃঙ্খল বিশ্ব সৃষ্টি করল কে? অর্থাৎ এই বৈজ্ঞানিকের এই বই লেখার মূল উদ্দেশ্যই হলো বিশ্ব স্রষ্টা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি। যা সব সময়ই নাস্তিক্যবাদী ব্যক্তিরা প্রচার করে থাকেন। সাধারণভাবে বিশ্ববাসী এই সব বিজ্ঞানীদের কথায় বা লেখায় বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত ধর্ম ঈশ্বর বা তার দেওয়া পার্থিব বিধি-বিধান না মানার এক ধরনের লাইসেন্স পেয়ে যায়। মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত জ্ঞানীরা বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিকদের এই সীমাবদ্ধতা জানেন ও তা প্রকাশ করেন।

আসলে ইংরেজী Science শব্দের মধ্যেই এর সীমাবদ্ধতা নিহিত রয়েছে। Science শব্দটি মূল ল্যাটিন যে শব্দ থেকে সৃষ্ট তার অর্থ জ্ঞান বা বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটি Sense তথা ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে যে বিষয় বা জ্ঞান অর্জন করা হয় তাই বুঝিয়ে থাকে। আর আমরা সবাই জানি যে, ধর্মীয় জ্ঞানের মূল উৎস হলো ওহী তথা ঐশী জ্ঞান যা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বিষয়। যাহোক, বিজ্ঞান যে ভুল বা মিথ্যা তথা অনুমান ভিত্তিক কথা বলে তার অন্য কোনো উদাহরণ বা তত্ত্ব বা তথ্যে না গিয়ে ষ্টিফেন হকিং এর নিজের কি জীবনে যে চিকিৎসা বিজ্ঞান ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাই লিপিবদ্ধ করছি। "ষ্টিফেন হকিংকে ১৯৬৩ সালে তার মোটর নিউরন ব্যধির (যাকে এ এল এম ব্যধিও বলা হয়) জন্য ডাক্তার বলেছিলেন যে, তিনি আর দু'বছর বাঁচবেন। ষ্টিফেন নিজেই বলেন, আসলে যে ডাক্তার আমার রোগ নির্ণয় করেছিলেন, তিনি আমার দায়িত্ব ত্যাগ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন করার মতো আর কিছু নেই। হকিং বলেন কিন্তু আমি মরিনি। ষ্টিফেন হকিং সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আরও বলেছিলেন যে, তিনি কখনও জনক হতে পারবেন না। অথচ তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীও ত্যাগ করেছেন। এবং তিনি তিন সন্তানের জনক হয়েছেন। ১৯৮৫ সালে জেনেভার সার্ন নামক আনবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে যান, তিনি হঠাৎ তার নিউমোনিয়া হলো যা মোটর নিউরন ব্যধিতে হয়ে থাকে ও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ষ্টিফেন বলেন, আমার নিউমোনিয়া হলো। ফলে আমাকে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। জেনেভার হাসপাতাল আমার স্ত্রীকে বলল, জীবন রক্ষার যন্ত্রটা চালিয়েও কোনো লাভ নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী রাজি হলেন না। আমাকে বিমানে করে কেম্বিজে এ্যাডেন ব্রুকস (Adden Brooks) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে রজার গ্রে (Roger Grey) নামক একজন সার্জন

আমার ওপর ট্রাকিও ষ্টামি অপারেশন করেন, এই অপারেশনে আমার জীবন বাঁচল কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর চলে গেল।"[৪৪]

এই ষ্টিফেন হকিং চিকিৎসাবিদদের সকল অনুমান ভুল প্রমাণ করে এখন পর্যন্ত ২০১৫ জুলাই, পর্যন্ত জীবিত আছেন। তার সর্বশেষ অনুমান হলো বেহেশেত দোজখ বলে কিছু নাই। এ কারণেই কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী বা দার্শনিক যা বলেন তা কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই না করে তাকে বিশ্বাসও করা উচিত নয় আর তাই তা বাস্তবায়ন করার প্রশ্নই উঠেনা। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবালের বিজ্ঞানের কাজ সম্পর্কে তার বিখ্যাত কবিতা জানতে চেষ্টা করব– "মাগরেবের (পাশ্চাত্য) ঐ বিজ্ঞান সে নাকি খুব গৌরবের,
মানুষ মারার অস্ত্র তৈয়ার কাজ হলো ঐ বিজ্ঞানের,
পূঁজিবাদের ভিত্তির ওপর যে সভ্যতার ভিত্তি পাত,
টিকবেনা কো যতোই দেখাও কারিগরির তেলেসমাত।"

তবে কিছু সত্যান্বেষী বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী, তারা একটি Theory আবিষ্কার করেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে Gaia Hypotheisis এই থিওরী বা মতবাদের মূল কথা হলো মানুষের আচরণ দ্বারাই আকাশ ও পৃথিবীর জড় ও শক্তি জগতে যাবতীয় পরিবর্তনগুলো ঘটে। অর্থাৎ পৃথিবী যেন একটি জীবন্ত সত্তা। সে মানুষের আচরনের প্রতি সাড়া দেয়। আমরা সবাই সাধারণ কথা শুনে আসছি, যত্রতত্র গাছ কেটো না, তাহলে বৃষ্টি কম হবে, পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলনা-তাহলে পরিবেশ দূষিত হবে। রোগব্যধি ছড়াবে। এই কাণ্ডজ্ঞানের বৃহত্তর পরিসরে ঢুকলে আমরা বুঝতে পারব যে 'যাকাত' না দিলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়, মিথ্যা কথার ব্যাপক প্রসার ঘটলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। এ গুলো প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থেই বাস্তব সত্য। তাই তা অবিশ্বাসের প্রশ্নটিই অবান্তর।

[৪৪] কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা, পৃষ্ঠা ১৪৬, ষ্টিফেন হকিং নাস্তিকতা ও ইসলাম, লেখক –মুহাম্মদ সিদ্দিক, পৃ. ২৫।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন

'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ, ব্যবহার স্বভাবগত গুণাগুণ, ধর্ম, বাইরের জগত। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রকৃতি বলতে দৃশ্যমান জগতের স্বাভাবিক ভাবে যে ঘটনা ঘটে বা পরিবর্তন সূচিত হয় তাকে প্রকৃতি বলে। অন্য কথায় প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক, পরিবর্তনশীল আচরণ রয়েছে। যা নতুন সৃষ্টির ভিত্তি। যা প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার একটি অদৃশ্য আইনের মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই প্রাকৃতিক পরিস্থিতি গুলির স্বাভাবিক পরিবর্তন কোনো দুর্যোগ নয়; বরং তাই-ই হলো প্রকৃতির প্রাণচঞ্চলতার নিদর্শন। প্রকৃতির অন্য একটি অর্থ হলো প্রকৃত উৎকৃষ্টকৃত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

উদাহরণ: সূর্যতাপ ভূমিকে শুকিয়ে দেয়, বায়ু পৃথিবীর শুষ্ক জমিনের দিকে মেঘকে প্রবাহিত করে- এটা তার প্রাকৃতিক স্বভাব।

পবিত্র কোরআনে এই বিশ্ব প্রকৃতির স্বাভাবিক আচরণ, তার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرىً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْموْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"তিনিই (আল্লাহ) তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাসকে ছেড়ে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ঘন মেঘ বয়ে নিয়ে আসে, তারপর আমি তাকে প্রাণহীন ভূখণ্ডের দিকে পাঠাই, পরে তার থেকে বৃষ্টি ঝরাই। তারপর আমি তা দিয়ে যাবতীয় ফল-মূল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে আমি জীবিত করব যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পার।" [সূরা ০৭ আরাফ, আয়াত-৫৭]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِٱلأَبْصَارِ

"তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তাদেরকে একত্র করেন ও পরে পুঞ্জীভুত করেন; তুমি দেখতে পাও, তারপর তার থেকে বৃষ্টি নামে। আকাশের শিলাস্তুপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা, আর এ দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন আর যাকে ইচ্ছা তার উপর

থেকে এ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুত ঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়।" [সূরা ২৪ নূর, আয়াত-৪৩]

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, যা মেঘমালকে সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি মেঘমালাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন, আর তুমি তার থেকে বৃষ্টি ঝরা দেখতে পাও। তার দাসদের মধ্যে তিনি যাদের উপর ইচ্ছা এ দান করেন, ওরা তখন খুশীতে উৎফুল্ল হয়।"

[সূরা ৩০ রূম, আয়াত-৪৮]

وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ

"ওরা যখন হতাশ হয়ে পড়ে তখন বৃষ্টি পাঠান ও তার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার যোগ্য।" [সূরা ৪২ শুরা, আয়াত-২৮]

এ সকল আয়াতে আল্লাহতায়ালা বিশ্ব-ভ্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, মালিক তথা প্রশাসক এবং মানব জাতির অভিভাবক হিসাবে- বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি, বরফ প্রভৃতি শক্তিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন মর্মে ঘোষণা করেছেন। আর এভাবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো যার যার দায়িত্ব পালনের কাজে রত থাকে। প্রতিটি বস্তুর স্বভাব অনুযায়ী প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের চাঞ্চল্য তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং গতিবিধি সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় নয়; বরং তা হলো প্রকৃতির স্বভাব। এরই ফলশ্রুতিতে বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি সংঘটিত হয়। আবহাওয়া তথা জলবায়ুর কর্ম-ধারাকে চালুরাখার এই প্রতিক্রিয়া-ই প্রকৃতির জীবন।

এ ভাবে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতির কারণ হয়, তবে তা প্রকৃত ধ্বংসাত্মক তথা বিপর্যয়ের রূপ নেয় যখন মানুষ সীমালংঘন করে। এ সম্পর্কে আল-কোরআন–

فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةً مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

১। "এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে বলো, আমি তো তোমাদেরকে এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি; যেমন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আদ ও সামুদ।" [সূরা ৪১ হা-মিম-সাজদা, আয়াত-১৩]

فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ

২। "কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল, তাই ওদের উপর বজ্র পতিত হলো আর ওরা অসহায় হয়ে তা দেখল।"

[সূরা ৫১ জারিয়াত, আয়াত-৪৪]

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ

৩। "ওদেরকে উপেক্ষা করে চলো সে দিন পর্যন্ত, যে দিন ওরা বজ্রাহত হবে বা বেহুশ হয়ে পড়বে।" [সূরা ৫২ তুর, আয়াত-৪৫]

মানবীয় কষ্ট ও স্বস্তি

জলবায়ুর নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ড তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থা মানুষের জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে, তবে তা দুর্যোগ বা বিপর্যয় নয়। আল্লাহ চান মানুষ জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হোক। পারস্পরিক মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে সে চারিত্রিক সাধনা করে উন্নততর মানবীয় গুণ অর্জন করুক যাতে তাকে এই সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তীতে সে বৈষয়িক উন্নতি অর্জন ও পরকালে বেহেশত লাভ করার যোগ্য হয়। এ জীবন সংগ্রাম বা কষ্ট সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে-

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً
إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً
فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبْ

১। তাই নিশ্চয় কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি রয়েছে। অতএব যখন অবসর পাও তখন পরিশ্রম করো। আর তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো। [সূরা ৯৪ আলাম নাশরাহ্, আয়াত-৫-৮]

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ فِى كَبَدٍ

২। আমি মানুষকে শ্রম নির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। [সূরা ৯০ বালাদ, আয়াত-৪]

এমনকি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও সফলতার পূর্বশর্ত হলো কঠোর শ্রম ও আত্মত্যাগ কষ্টসাধ্য পথ সম্পর্কে কোরআন–

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ
وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ
وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَينِ
فَلاَ ٱقتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ
وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ
فَكُّ رَقَبَةٍ
أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ
يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ
أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ
ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ

"আমি কি তাকে দুটো চোখ, জিহ্বা আর ঠোঁট দিই নি? আর দুটো পথ কি তাকে দেখাই নি। সে তা কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি। তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কি? সে হচ্ছে দাস মুক্তি এবং দুর্ভিক্ষের দিনে অনুদান, এতীম আত্মীয়কে বা দুর্দশাগ্রস্থ অভাবীকে তার উপর তাদের সামিল হওয়া যারা বিশ্বাস করে, পরস্পরকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয় ও উপদেশ দেয় দয়াদাক্ষিণ্যের।" [সূরা ৯০ বালাদ, আয়াত-৮-১৭]

তাই বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট এগুলো জীবনর অংশ জীবনের অভিশাপ নয়। এর মাধ্যমে মন বদলের খেলা চলে। কিন্তু দুঃখ-দুর্দশায় পড়েও অনেকে বেশি আক্রোশ পরায়ন ও অহঙ্কারী হয়ে উঠে, বিনয়ী ও তাওবা প্রবন নয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহ ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে ইহকালে অঢেল ভোগের উপকরন দান করে তাকে জাহান্নামের আগুন বরাদ্দ করে থাকেন। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"আর তোমার পূর্বেও জাতির নিকট আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। তারপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-দৈন্য দ্বারা পীড়িত করেছি। যাতে তারা বিনীত হয়। আমার শাস্তি যখন তাদের উপর পড়ল তখন তারা কেন বিনীত হলো না? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে তারা মত্ত হলো তখন হঠাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, ফলে তারা তখন নিরাশ হয়ে পড়ল। তারপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো। আর প্রশংসা আল্লাহরই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

[সূরা ০৬ আনআম, আয়াত-৪২-৪৫]

এটি আল্লাহর স্থায়ী একটি বিধান। বর্তমান পাশ্চাত্য দেশ বা আমেরিকার দিকে তাকালে আমরা এই আয়াতের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ঐসব বস্তুবাদী উন্নত দেশসমূহ অতীতে বহু আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের পর বর্তমানে

বৈষয়িক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। কিন্তু তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে তাই এসব দেশে ছোটখাট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে টর্নেডো, অস্বাভাবিক বরফপাত, বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি হচ্ছে। এখন যদি তারা তাদের প্রকৃত দুর্বলতা বা সত্য স্বীকার করার মতো মানসিকতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে অতীতের যে সব জাতি খোদায়ী গজবে ধ্বংস হয়েছিল ঐসব দেশও সেই তালিকায় যোগ হবে।

আল্লাহতালা মানুষের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আচরণ-বিধি নির্ধারণ করে রেখেছেন। এই পরিমান বা মাত্রার যদি ভারসাম্যতা নষ্ট হয়। তাহলে এই আচরণ-বিধি লংঘিত হয় তখনই প্রাকৃতিক শক্তি দুর্যোগ বা মহাদুর্যোগে পরিণত হয়। কারণ প্রকৃতির স্বভাব আমাদের সীমালংঘনের প্রতি বিরূপভাবে সাড়া দেয়। নৈমিত্তিকভাবে ঘটলেও কোনো ঘটনা যদি ব্যাপক ধ্বংসাত্মক হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাও আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি স্বরূপ আগমন করেছে।

মানবীয় আচরণ ও ঐশী দণ্ডবিধান

এ ব্যাপরে মানুষের আচরণের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আর্থ সামাজিক বিপর্যয়ের সরাসরি সম্পর্কের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে ও স্থলে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ে, তাই তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে।" [সূরা ৩০ রূম, আয়াত-৪১]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
أُولَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

"যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, নবীদের অন্যায়ভাবে শহীদ করে ও যে সব লোক ন্যায়সংগত আদেশ দেয় তাদেরও হত্যা করে। তুমি তাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। এই সব লোকের ইহকাল ও পরকালের কাজকর্ম ব্যর্থ হবে ও তাদের কেউ সাহায্য করবেনা।"

[সূরা ০৩ আল ইমরান, আয়াত-২১-২২]

لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে ও যা নিজেরা করেনি এমন কাজের প্রশংসা পেতে ভালোবাসে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এমন কখনও ভেবোনা তাদের জন্য আছে নিদারুন শাস্তি।"

[সূরা ০৩ আল ইমরান, আয়াত-১৮৮]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি, অর্থসংকট ও দুঃখ-দারিদ্র তাদের স্পর্শ করেছিল, আর তারা ভীত কম্পিত হয়ে পড়েছিল এমনকি রাসূল ও তাঁর উপর যারা বিশ্বাস করেছিল তারা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। জেনে রেখ আল্লাহর সাহায্য তো কাছেই।"

[সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-২১৪]

وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِىَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ

"মুসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য নির্বাচন করল। তারপর ভূমিকম্প যখন তাদেরকে আঘাত হানল তখন মুসা বলল, হে আমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে এর আগেই তুমি এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারবে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে তার জন্য কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে? এতো তোমার পরীক্ষা যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর আর যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।" [সূরা ০৭ আরাফ, আয়াত-১৫৫]

وَٱلْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً
فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفاً
وٱلنَّاشِرَاتِ نَشْراً
فَٱلْفَارِقَاتِ فَرْقاً
فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً
عُذْراً أَوْ نُذْراً
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

"শপথ (সেই বাতাসের যাদের) একের পর এক আলত করে ছেড়ে দেওয়া হয়, যারা ঝড়ের বেগে ধেয়ে যায়। শপথ তাদের যারা উড়িয়ে ছড়িয়ে, ছিন্ন-ভিন্ন করে, তারপর পাঠায় এক উপদেশ অজুহাত ও হুশিয়ারী, নিশ্চয়ই তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা আসছেই।"

[সূরা ৭৭ মুরসেলাত, আয়াত-১-৭]

مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَاراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَاراً

"ওদের পাপের জন্য ওদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও পরে ওদের ঢোকান হয়েছিল জাহান্নামে তারপর ওরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহয্যকারী পায়নি।"

[সূরা ৭১ নূহ, আয়াত-২৫]

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

"তারপর ভূমিকম্প তাদের উপর হামলা করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে শেষ হয়ে গেল।" [সূরা ০৭ আরাফ, আয়াত-৭৮]

ٱلْحَاقَّةُ
مَا ٱلْحَآقَّةُ
وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَّةُ
كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِٱلْقَارِعَةِ

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ

"ধ্রুবসত্য, ধ্রুব সত্য কি, ধ্রুব সত্য সম্বন্ধে তুমি কি জান? আদ ও সামুদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয় অস্বীকার করেছিল। সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়ে।" [সূরা ৬৯ হক্কা, আয়াত-১-৫]

وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ

"আর আমি আদ ও সামুদকে (ধ্বংস করেছিলাম) ওদের বাড়ী-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের চোখে আকর্ষণীয় করে ছিলো ওদের আকর্ষণীয় করেছিল ও ওদেরকে বাধা দিয়েছিল সৎপথ অবলম্বন করতে। যদিও ওরা বুদ্ধিমানই ছিল।"

[সূরা ২৯ আনকাবুত, আয়াত-৩৮]

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

"যে পথে লোক চলাচল করে তার পাশে লুতের সম্প্রদায়ের ধ্বংসস্তুপ এখনও বিদ্যমান। এর মধ্যে তো বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

[সূরা ১৫ হিজর, আয়াত-৭৬-৭৭]

উল্লেখ্য, লুত (আ.)-এর স্ত্রীকে খোদায়ী গজব হিসাবে পাথরের মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে এবং Dead Sea ও এর আশে-পাশের এলাকা খোদার গজবের শিকার হয়েছিল তা বর্তমানেও দৃশ্যমান। বৈজ্ঞানিকগণ ব্যাপক গবেষণা করেও এর মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম হন নি।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে যে সব সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে তা ছিলো মূলত খোদায়ী গজব যা সেই সময়কার লোকদের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার প্রভৃতির কারণে আল্লাহতালার কঠোর আযাব বিশেষ। আর একটি বিষয়ও অবহিত হওয়া যায় যে, ঐতিহাসিকগণ যে গুলোকে পুরাকৃর্ত্তিক গবেষণার বিষয় বলে যেসব মানুষের পরিত্যক্ত আবাসস্থল পেয়ে থাকেন। সে গুলো ধ্বংসের কারণও ছিলো তাদের কুকর্মের প্রতিফল হিসাবে ঐশী শাস্তি।

এটি আল্লাহর একটি স্থায়ী বিধান সেটি হলো মানুষ যখন সীমালংঘনমূলক আচরণ করে তখন মৌসুমী আবহাওয়া জনিত পরিবর্তন নয়; বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগও বিপর্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহ মানব জাতিকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন এবং মানুষ যদি নিজেদের খোদায়ী বিধানের আলোকে সংশোধন না করে তবে এক পর্যায়ে সেই সভ্যতা বৃহত্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহতালা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তথা খোদায়ী গযবের ব্যাপারে মানুষকে নিশ্চিন্ত না হওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন–

أَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ
أَمْ أَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نكِيرِ

"তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি হঠাৎ করে তোমাদের নিয়ে মাটিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না, আর তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে বা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কাঁকর ছিটান ঝড় বইয়ে দেবেন না? তখন তোমরা জানবে কি কঠোর ছিলো আমার হুশিয়ারী। এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা বলেছিল, তাই ওদের উপর আমার শাস্তি কি কঠিন হয়েছিল।" [সূরা ৬৭ মূলক, আয়াত-১৬-১৮]

وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ

"তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তাতো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।" [সূরা ৪২ শুরা, আয়াত-৩০]

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

"তাদের শাস্তি এমন না, যা থেকে নিঃশংক থাকা যায়।"

[সূরা ৭০ মায়ারিজ, আয়াত-২৮]

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلاَ فِيۤ أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِى كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ
لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদ আসে আমি তা ঘটানোর পূর্বেই লিখা হয়; আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ; এ জন্য যে তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও। আর যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য খুশীতে উৎফুল্ল না হও। আল্লাহ ভালোবাসেন না উদ্ধত অহঙ্কারীদের।" [সূরা ৫৭ হাদীদ, আয়াত-২২-২৩]

وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاً

"আর আপনার রব ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি ওদের (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দিতে চাইলে, তিনি ওদের শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতেন, কিন্তু ওদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মূহুর্ত রয়েছে। যা থেকে তাদের পরিত্রান নাই।" [সূরা ১৮ কাহাফ, আয়াত-৫৮]

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ

"আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মূহুর্তকাল দেরী বা তাড়াতাড়ি করতে পারে না।"

[সূরা ১৬ নাহল, আয়াত-৬১]

لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি এসে পড়ত।" [সূরা ০৮ আনফাল, আয়াত-৬৮]

কুরআনের এ সমস্ত বক্তব্য থেকে যে কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, কুরআনের মতে ধীরে ধীরে এবং সাধারণ লোকের অজ্ঞাতসারে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অর্থাৎ কোনো জাতি বা সভ্যতা খোদায়ী গজবের উপযুক্ততা অর্জন করে থাকে। বহুকাল পর্যন্ত মানব জীবনের আর্থ/সামাজিক পরিস্থিতির বহির্ভাগ ধীর ও শান্ত থাকে, যদিও তারই নীচে চাপ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। আর একদিন তা বিদ্যুত ও বজ্রকণ্ঠে ফেটে বের হয়ে যায়। আমরা পানিতে চাপ দেওয়া ও তা ফোটানোর মতো একটি বিষয় থেকে এর একটি উদাহরণ পেশ করতে পারি। পানির উপরিভাগ প্রথমে শান্ত ও অনড় মনে হয় কিন্তু নীচে যে উত্তাপ সঞ্চিত হতে থাকে, তা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছার পরে বাইরের অংশের উপর ফেটে পড়ে এবং পানি ফুটতে শুরু করে। একইভাবে কোনো সম্প্রদায়ের সামাজিক ও নৈতিক অনাচারের পরিণতি যথেষ্ট দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বোধগম্য হয় না। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের অসদাচরণের কোনো পরিণতি নেই। পরিণতি বা কুফল সমাজে কোনো বৃহৎ পরিবর্তন আনয়ন করার মতো শক্তি তথা ব্যাপক সামাজিক বিপর্যয় বা শাস্তির যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি বলে বুঝতে হবে। তবে তা থেকে কোনো ক্রমেই এই ধরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। এই মধ্যবর্তী সময়ে যা ইচ্ছা সবই আল্লাহর তরফ থেকে হওয়ার বা করার সম্ভাবনা থেকে যায়। যদি এ সময়ে লোকেরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিজেরা ভালো হয়ে যায়, তবে তাদের পূর্বেকার অসাদাচরণের কুফল নষ্ট হয়ে যাবে এবং এমন সম্প্রদায় তাদের হারানো শক্তি, সংহতি ও গৌরব ফিরে পেতে পারে। আর যদি তারা অন্যায় আচরণ থেকে বিরত না হয়; আধ্যাত্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের অপকর্মের কুফল ও পরিণতিসমূহের শক্তি

বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উহা কোনো রাজনৈতিক পরাজয় বা সামাজিক বিপর্যয়রূপে বিস্ফোরিত হয়ে দুরাচারীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সাধন করে। সংক্ষেপে এটাই কোরআনিক ঐতিহাসিক সময় তত্ত্ব, যা মানব সমাজের কাঠামো স্থির করে দেয় এবং ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করে।

আল্লাহতালার এই বিধান একটু দৃষ্টি দিলেই আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ইংল্যান্ডের রাজার শিরচ্ছেদ (১৬৪৯), ইউরোপের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের (১৫১৭) মাধ্যমে পোপের ক্ষমতার সীমাবদ্ধকরন এবং ফরাসী বিপ্লবের সীমাহীন হত্যাযজ্ঞের (১৭৮৯) মাধ্যমে ব্যাপক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭৭৬), ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কুফল দুই বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ ১৯১৪-১৮), দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। এই সব ঘটনার মধ্যদিয়ে কোটি কোটি লোক ক্ষয় ও ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে।

অনুরূপভাবে, মুসলিম রাজা বা শাসকদের অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধর্মের কোরআনীয় শাসন ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক সাম্যের যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির অবসান ঘটিয়ে রোমান, পারস্যের রাজনৈতিক মডেল হিসাবে রাজতন্ত্র গ্রহণ এবং এর সকল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনাচারসমূহকে অনুসরনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মীয় সমস্ত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধি-বিধান ও আচার-আচরণকে ধ্বংস করা ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত করা। বর্তমান সময়েও তা অব্যহত রয়েছে। ফলে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশগুলি বিধর্মী শাসকদের অপশাসনের শিকার হয়ে অকল্পনীয় ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয় যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।

মানবজাতি বিশেষ করে মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্য পবিত্র কোরআনে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের রূপরেখা প্রদান ও তা অনুসরণ না করায় ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর সতর্ক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্তন বা মৌসুমী পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে একই সূত্রে বর্ণনা করে বা ব্যাখ্যা করে মুসলমান জনগোষ্ঠি অতীতের খোদাদ্রোহী জনগোষ্ঠির মতো আল্লাহর বাণীকে অকার্যকর বা গুরুত্বহীন মনে করছে। ফলে তারা যে এক মহা ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাই আমাদের গবেষণার বিষয়।

উপসংহার

এই পৃথিবীর স্রষ্টা, মালিক, প্রশাসক আল্লাহতালা। তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য কিছু নিয়মকানুন বেধে দিয়েছেন। তাই কথা ছিলো সবাই মিলে একই দিকে তাকানোর- একই আইন মানা একই আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করে তারই উপাসনা করার। তাহলে সবার পৃথিবী হতো একটি অখণ্ড পৃথিবী এবং এর ফলে তাতে ভারসাম্য থাকত, উগ্রতা থাকত না, প্রকৃতির স্বভাব থাকত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকত না। কিন্তু আল্লাহর এই পৃথিবীতে বসবাস করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা বিধাতা বানিয়েছি আমাদের নফস বা প্রবৃত্তির, টাকার, ক্ষমতার, আনন্দ-ফুর্তির, দেহের রক্ত-মাংসের, গোত্রের অহমিকার, বিদ্যার, জাতীয়তার, চেহারার ইত্যাদি। যেহেতু আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য-সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার পূজারী হয়েছি ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে গতিশীল রয়েছে। দুই স্তরের মধ্যে ব্যবধান খুব বেড়ে যাচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে নিম্নচাপ, উর্ধ্বচাপ ইত্যাদি। যে মৌসুমী বাতাস এক সময় আমাদের জমির উপর প্রাণদায়ী বৃষ্টি বয়ে এনেছিল সমৃদ্ধশালী করার জন্য, সেই বাতাসই আমাদের চরিত্রের লোলুপতা ও স্বার্থপরতার কারণে আমাদের ফসল ভরা জমির উপর দিয়ে ঝড় হয়ে বয়ে গেল যেন আমরা সংকীর্ণতার পুরস্কার- শাস্তি পাই।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
وَلاَ يَسْتَثْنُونَ
فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ
فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ
فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ
أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ
فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ
وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآلُّونَ
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ
قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ

قَالُواْ يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ
كَذٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

"আমি ওদেরকে পরীক্ষা করব, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম সেই বাগানের মালিকদেরকে, যখন ওরা শপথ করে বলেছিল যে, ওরা সকালে বাগানের ফল পেড়ে আনবেই, কোনো ব্যতিক্রম না করে। তাই যখন ওরা ঘুমিয়েছিল তখন তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এক (প্রাকৃতিক) বিপর্যয় সেই বাগানে হানা দিল। ফলে তা পুড়ে রাতের আঁধারে কালো হয়ে গেল। সকালে ওরা একে অপরকে ডেকে বলল, যদি ফল তুলতে চাও তবে সকাল-সকাল বাগানে চলো। তারপর ওরা ফিসফিসিয়ে কথা বলতে বলতে বলল, আজ যেন কোনো মিসকিন বাগানে তোমাদের কাছে ভিড়তে না পারে। ওরা তাদেরকে ঠেকাতে পারবে এই বিশ্বাসে সকালে বাগানের দিকে গেল। তারপর ওরা যখন বাগানের চেহারা দেখল (তখন) বলল, আমরা তো দিশা হারিয়েছি। না আমরা ঠকে গেছি। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোকটি বলল, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করতে বলিনি? তখন ওরা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করছি। নিসঃন্দেহে আমরা সীমালংঘন করেছিলাম। তারপর ওরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। ওরা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো সীমালংঘন করেছিলাম। আশা করি, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে আরও ভালো বাগান দিবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফেরালাম। শাস্তি এভাবেই আসে আর পরকালের শাস্তি আরও কঠিন যদি তারা জানত।" [সূরা ৬৮ কলম, আ-১৭-৩৩]

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ঘটনায় জানা গেল ঐ লোকেরা দৃশ্যত মিসকিনদের তাদের অংশ দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ বা অনীহা প্রকাশ করছিল। ফলে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারে তাদের ফসল থেকে বঞ্চিত হলো। অর্থাৎ কারো প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করাও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ঘটিয়ে থাকে মর্মে কোরআন ঘোষণা করছে।

অথচ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়কে আমরা নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা বলে একটি মতবাদ তৈরী করছি এবং সেই ব্যাখ্যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছি। এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনাচার, অবিচার, ব্যভিচারের কথা বেমালুম ভুলে থাকতে পারছি।

প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর (Energy) প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক রয়েছে। একটি বিশেষ অবস্থায় একজাতীয় শক্তি অন্য একজাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত

হয়। যেমন আমরা গতিশক্তিকে বিদ্যুত শক্তিতে, তাকে আলো বা তাপশক্তিতে আবার প্রয়োজনে তাকে আবার গতি শক্তিতে রূপান্তরিত করি। প্রকৃতির শক্তিগুলি মূলতঃ একই শক্তির রূপান্তর এবং এই রূপান্তর প্রাথমিকভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মাত্রায়/পরিমানে ঘটেই চলেছে। তার মধ্যে তারতম্য সৃষ্টির কারণ হলো মানুষেরই প্রকাশ্য ও গোপন কর্মফল। আর কিছুই নয়। এটা হলো কোরআনে বর্ণিত মহা বিজ্ঞান তথা Super Science পক্ষান্তরে প্রচলিত বিজ্ঞান আমাদের এ ব্যাপারে শুধু একটি স্তরের তথ্যই দিতে পারে। যেমন– বেশি বেশি গাছ কাটলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, কিন্তু এই বিজ্ঞানের যে বিষয়টি জানা নাই যে কাউকে তার মা-বাপ তুলে গাল দিলে বা এতিমের গলা ধাক্কা দিলে, সমাজে ব্যাপক ব্যভিচারের ও মদ্যপানের প্রসার ঘটলে বা ঘুষ দাতার বদ্-দোয়ার কারণে টর্নেডো, ভূমিকম্প, প্লেগ ইত্যাদির উদ্ভব ঘটতে পারে।

প্রকৃতির প্রতিটি স্তরের উপর আল্লাহর আদেশ আপতিত হয় যেন তার মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছে আমাদের কর্মফলকে ফেরত পাঠাতে পারেন।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ

"তিনি জানেন মাটিতে যা প্রবেশ করে আর তা থেকে যা বের হয়, আর যা আকাশ থেকে নামে, আর যা কিছু আকাশে উঠে।" [সূরা ৩৪ সাবা, আয়াত-০২]

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا

"আল্লাহই সাত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর এভাবেই আকাশ ও পৃথিবীর সকল স্তরে তার নির্দেশ নেমে আসে (তোমাদের কর্মের পুরস্কার দেয়ার জন্য) যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, আর সমস্ত কিছুই তার জানা।" [সূরা ৬৫ তালাক, আয়াত-১২]

শুধু কাজই নয়, মুখের কথাও কাজ, এমনকি চিন্তাও একটি কাজ ভালো-মন্দ অনুযায়ী তারও ফলশ্রুতি রয়েছে।

আমরা আমাদের কর্মদ্বারা আসামী হই, আমাদের কর্মফল আমাদের বিচার করবে। আমরা যদি এখনও আমাদের মন-চিন্তাধারা-কথার ধারা (Pattern of Talking/Thinking) না পাল্টাই তাহলে অচিরেই আমাদের কর্ম আমাদের জন্য চমৎকার উপহার নিয়ে আসছে– ঘুর্নিঝড়, ভূমিকম্প, প্লেগ, খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মশা, সামাজিক হানাহানি, গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক শক্তির আক্রমন ইত্যাদি। প্রশ্ন আসতে পারে সামান্য মুখের কথায় এতো কিছু?

হাঁ! মুখের কথাকে সামান্য বলছেন। অথচ ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি 'সামান্য' মুখের কথায় রক্তক্ষয়ী কোন্দল, গৃহযুদ্ধ এমনকি যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। আমরা যখন কোনো ক্ষেত্রে কারো অত্যাচারকে ঠেকাতে ব্যর্থ হই, তখন তো সামান্য মুখের কথার অভিশাপ থেকেও বিরত থাকতে পারিনা। আর ঐ অত্যাচারী ঐ "সামান্য" অভিশাপের কথা শুনে সেই ব্যক্তিকে আরো নির্যাতন করে থাকে এমন ঘটনা আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে।

انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْماً مُّبِيناً

"দেখ! তারা আল্লাহর সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা বানায়, আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এই যথেষ্ট।" [সূরা ০৪ নিসা, আয়াত-৫০]

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

"আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী আর কে? আল্লাহ তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

[সূরা ০৬ আন্আম, আয়াত-১৪৪]

كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ
فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

"সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যা করতে তার শাস্তির স্বাদ নাও। ওদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা বলেছিল, তাই শাস্তি ওদের গ্রাস করেছিল ওদের অজ্ঞাতসারে, তাই আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত করেন, আর তাদের পরকালের শাস্তিও হবে কঠিন। যদি এরা জানত।"

[সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত-২৫-২৬]

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئاً وَلاَ مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ দেমাকের সঙ্গে নিজের মতবাদে অটল থাকে যেন তা সে শোনেনি। ওকে খবর দাও নিদারুন শাস্তির। যখন সে আমার কোনো আয়াত জানতে পারে তখন তা নিয়ে সে হাসি-ঠাট্টা করে। ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ওদের জন্য জাহান্নাম প্রতীক্ষা করছে; ওদের

কৃতকর্ম ওদের কোনো কাজে আসবে না। ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের অভিভাবক ঠিক করেছে তারাও নয়। ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

[সূরা ৪৫ জাসিয়া, আয়াত-৭-১০]

অবিশ্বাসী খৃষ্টানরা যখন বলে যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর ছেলে, তখন তো আল্লাহ নিজেই কথাটিকে সামান্য মুখের কথা বিবেচনা করেন না; বরং সেই কথার ভারে আকাশ পড় পড় হয়।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً
تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدّاً
أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَداً
وَمَا يَنبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً

"তোমরা তো এক আজব কথা বানিয়েছো, এর জন্য হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী বিদীর্ন হবে ও পর্বত মণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ জন্য যে, তারা করুনাময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ করুনাময়ের জন্য এ শোভন নয় যে তার সন্তান হবে।" [সূরা ১৯ মরিয়াম, আয়াত-৮৯-৯২]

تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلاۤئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى ٱلأَرْضِ أَلاۤ

"আকাশ তো উপর পড় পড় হয়ে যায়, আর তাই ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা কীর্তন করে ও যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" [সূরা ৪২ শূরা, আয়াত-০৫]

আর তখন সেই আকাশকে ধ্বসে পড়া থেকে বাঁচায় ফেরেশতাদের সামান্য মুখের কথাই- আল্লাহর নাম জপ তথা জিকির।

প্রশ্ন এটাও হতে পারে সামান্য মনের ভাবনা তথা পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা এ আবার এমন কি?

মনের ভাবনা বা চিন্তা শক্তিকে কি সামান্য গণ্য করার সুযোগ আছে? কারণ আমাদের ভবিষ্যত জীবন বলে যা কিছু রয়েছে, তা তো শুধুই স্বপ্নও কল্পনা। অথচ তাই-ই আমরা চিরকাল অন্তরে জিইয়ে রাখতে পছন্দ করি। এমন কি প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। "স্বপ্ন" বাস্তবায়ন করা ছাড়া আর কোনো কাজে আমরা পৃথিবীর শত লক্ষ-কোটি মিলিয়ন ডলারের সম্পদ ব্যয় করছি! বরং আল্লাহ বলেছেন যে মানুষের চক্রান্তের (চিন্তা/ভাবনা/পরিকল্পনা) কারণে পাহাড়ও টলমল অবস্থা হয়।

وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ

"ওরা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল; কিন্তু আল্লাহর কাছে ওদের চক্রান্ত অজানা নেই, যদিও ওদের ষড়যন্ত্র এমন যে পর্বতও টলে যায়।"

[সূরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াত-৪৬]

পবিত্র কোরআনের বাণী নিছক কথাবার্তা নয়। রাসূল (দ.)-এর বাণীও আমাদের আর দশজনের (দার্শনিক/বিজ্ঞানীসহ) আটপৌরে বাণীর মতো নয়; বরং যদি তা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হতো, তাহলে পাহাড় তুলো-তুলো হয়ে যেত।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"যদি আমি এ কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে নুয়ে পড়েছে, ভেঙ্গে পড়েছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থিত করছি, যাতে তারা চিন্তা করে।" [সূরা ৫৯ হাশর, আয়াত-২১]

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করো না আর নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচু গলায় কথা বল তাঁর সঙ্গে সেভাবে উচু গলায় বলো না; কারণ এতে তোমাদের ভালো কাজ বরবাদ হয়ে যাবে, আর তোমরা তা টেরও পাবেনা।" [সূরা ৪৯ হুজুরাত, আয়াত-০২]

অর্থাৎ কারো সামনে জোরে কথা বলাও একটি ভয়াবহ অপরাধ। যে কারণে মানুষের সব সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়।

এটাও প্রশ্ন হতে পারে- কাউকে ওজনে বা পরিমাপে কম দিলে তা অবশ্যই একটা অপরাধ, কিন্তু তার জন্য আকাশ ধ্বসে পড়বে, বাতাস জোরে বইবে, বৃষ্টি থেমে যাবে, রোগব্যাধি বেড়ে যাবে কেন? এর কারণ কোনো লোকের সঙ্গে জেনে বুঝে প্রতারণা করা যে কতবড় অপরাধ সে বিষয়ে আমাদের সঠিক ধারণা না থাকা। কারণ আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির মূলে রয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ মাপ ও পরিমান। সেই মাপকে নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে আমাদের মানবিকতা ও নৈতিকতার মাপ ও পরিমান বোধের সঠিক মাত্রার উপর।

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ
أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى ٱلْمِيزَانِ

"তিনি আকাশকে সমুন্নত রেখেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।" [সূরা ৫৫ রহমান, আয়াত-৭-৮]

এ কারনেই যদি আমাদের বাস্তব জীবনে মাপ-জোখ তথা পরিমান-পরিমিতির ব্যাপারে সীমালংঘন করলে আকাশের জানালার একটি কপাট যদি খুলে পড়ে, কিংবা বাতাসের জোর ঝড়ে পরিণত হয়, কিংবা আমাদের শরীরে যদি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের উপযুক্ত খাবার হিসাবে কিছু কলুষিত (হারাম) মাংস তৈরী হয় এবং এই ব্যাকটেরিয়ায় তা খেতে শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্যানসার AIDS বা অনুরূপ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু আছে কি?

এ প্রসঙ্গে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, বিজ্ঞান যা দেখতে বা জানতে পারেনা, বিজ্ঞান কি কখনও তাকে মিথ্যা বলেছে? কিভাবে? বিজ্ঞান তো প্রমাণ ছাড়া কিছু বলেনা বা বলা উচিত না। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য ষ্টিফেন হকিং এর মতো বৈজ্ঞানিক ও তার অনুসারী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কোনো বাস্তব প্রমাণ ছাড়াই ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্য নির্বিকার ভাবে অস্বীকার করে নিজে বিভ্রান্ত হচ্ছেন ও অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করছেন।

মহান আল্লাহতালা এদের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করুন। এটাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ :

(১) আহ্‌লে বাইত-ই ঈমানের ভিত্তি

(২) গাদীরে খুম থেকে দামেস্ক

(৩) পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে ইসলাম ধর্মের রাজনীতি

(৪) পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব : –একটি পর্যলোচনা

(৫) **On Religion And Politics**

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ . . .

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণ –আল্লামা আবু মনসুর আহ্‌মদ ইবনে আলী আত-তাবারসী (রহ.) **পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৪; বিনিময় মূল্য : ১০০/-**	**আশার আলো ইমাম মাহ্‌দী আলাইহিস সালাম** –ওয়াজহুল ক্বামার খান বাস্তাবী **পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬; বিনিময় মূল্য : ১২০/-**
ইসলামে হযরত আবু তালিবের অবদান [এহসানের প্রতিদানে এহসান ছাড়া আর কী হতে পারে?] – মোঃ নুরুল মনির **পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬; বিনিময় মূল্য : ১২০/-**	**উম্মুল মু'মেনিন খাদিজা আত-তাহিরা (রা.)** [অপরিশোধযোগ্য এক ঋণ] – সাইয়্যেদ আখতার আলী রিজভী **পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৬; বিনিময় মূল্য : ২২০/-**
কারবালা ও ইসলাম [ইসলামে বিভাজনের নেপথ্য] – সৈয়দ গোলাম আসকারী **পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫৬; বিনিময় মূল্য : ৩০০/-**	**হযরত যয়নাব বিনতে আলী (রা.)** [ইসলামে পূনর্জীবন দানকারিণী] – আবু তালেব আত-তাবরিজী **পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০০; বিনিময় মূল্য : ২৪০/-**
আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা **ও অন্যান্য কল্পকাহিনি** – আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাযা আসকারী **পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯০; বিনিময় মূল্য : ৩২০/-**	**হযরত আবুল ফজল আব্বাস (রা.)** [কারবালায় ইসলামের পতাকাবাহী] আবু তালেব আত-তাবরিজী **পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪০; বিনিময় মূল্য : ১৮০/-**
ঐতিহাসিক 'গাদীর-এ-খুম'-এর ভাষণ –আল্লামা আবু মনসুর আহ্‌মদ ইবনে আলী আত-তাবারসী (রহ.) অনুবাদ : ইরশাদ আহম্মেদ **পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৪; বিনিময় মূল্য : ১০০/-**	**হযরত আবু হুরায়রা (রা.)** –আল্লামা আব্দুল হুসাইন আল মুসাভি অনুবাদ : **মোস্তফা কামাল** **পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৮; বিনিময় মূল্য : ৩০০/-**
পবিত্র মক্কা ও মদিনা **এবং হজ্বের আহকাম** – মুহাম্মাদ নূরে আলম **পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৪; বিনিময় মূল্য : ৬০/-**	**মা ফাতিমা** **[জান্নাতী নারীদের নেত্রী]** মূল : **আল্লামা বাকের শরীফ আল কোরাইশী** অনুবাদ : **মোস্তফা কামাল** **পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৬; বিনিময় মূল্য : ৩০০/-**
ইমাম হাসান ও খেলাফত [ইতিহাসের অব্যক্ত অধ্যায়] –মোস্তফা কামাল **পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২৪; বিনিময় মূল্য : ২৬০/-**	**গাদিরে খুম থেকে দামেস্ক** – ডা. এ. এন. এম. এ. মোমিন **পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯২; বিনিময় মূল্য : ২২০/-**

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স

[[[হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি]]]

তরিকত-মারেফাত, সূফীবাদী, তা'সাউফপন্থী, আধ্যাত্মিকতা ও আহলে বাইতের ধারার বইসমূহ ঘরে বসে পেতে ফোন করুন

সরাসরি ০১৯৭৩৩৬৪৫২৯

যে কোন সংখ্যক বই হোম ডেলিভারির জন্য সার্ভিস চার্জ মাত্র ৫০/- টাকা

আপনার চাহিদা মোতাবেক বই বুঝে পাওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করুন

ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং : **01973364529** (Personal)

বিকাশ একাউন্ট নম্বর : **01973364529** (Personal)

পবিত্র কোরআনের আলোকে

সামাজিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ইসলামের ইতিহাস পুস্তকসমূহে ১০ই জিলহজ্বে আরাফাতের মাঠে রাসূল (দ.) যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাকেই বিদায় হজ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (দ.) ১০ই জিলহজ্ব বিদায় হজ সম্পন্ন করার পর 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে ১৮ই জিলহজ্ব তারিখেও এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবে ধারাবাহিক সনদের মূলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানব জাতির দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহ সাধারণভাবে এই ভাষণের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করে নাই। তাই বিষয়টি সর্বজন বিদিত নয় এবং বাস্তব জীবনে মুসলমান উম্মাহ এই ভাষণের মূল শিক্ষা কার্যত অস্বীকার করে জাতিগতভাবে এক মহা বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে এবং এই ধর্মের রাজনৈতিক মতবাদ **Theocracy** বা ঐশীতন্ত্র ধর্মীয়ভাবে বাদ দিয়ে নতুন ধরণের রাজনৈতিক মতবাদ সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধর্মে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কোনো ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমনকি কোনো কোনো মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ইসলাম বিরোধী ব্যক্তিবর্গ দাবি করে থাকেন মুসলমানগণ যে তাদের ধর্মকে **Complete code of Life** বলে থাকে তা একটি অবাস্তব ধারণা।

যদি এ ধারণা সত্য হতো তাহলে ইসলাম ধর্মে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় ইসলামের প্রাথমিক দিকেই এতো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনা করত না এবং এই প্রক্রিয়ায় রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র মুসলমান সমাজে জেঁকে বসত না। এই সব শাসক গোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের আর্থ-সামাজিক কল্যাণমূলক ও সংস্কারমূলক যেসকল কর্মসূচী পবিত্র কুরআন ও রাসূল (দ.) ঘোষণা করেছিলেন তা কার্যত বাতিল বা অকার্যকর করে দিয়েছে।

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স
Ale Rasul Publications
[[[হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি]]]
৩৯, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
01551 364529, 01973 364529, E-mail: ale.rasul@outlook.com
Find us on facebook ale.rasul@outlook.com
Follow us on twitter ale.rasul@outlook.com

ISBN : 978-984-91565-1-2